জাপানে বঙ্গনারী

সরোজ-নলিনী দত্ত, এম্, বি, ই

এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার প্রকাশিত
৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

এ, চৌধুরী
ফিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২৯নং কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা

নিবেদন

সরোজনলিনীর জাপান-ভ্রমণকাহিনী ছাপাইতে নানা কারনে দেরি হইয়া পড়িল। যাহা হউক এখন যে ইহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছি তাহাতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। সরোজনলিনার বড় ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেন দেশের কাজে লাগে। আশা করি তাঁহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইবে এবং তাহাতে তাঁহার অমর আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে। তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পৃথক পুস্তকাকারে ছাপাইবার আশা রহিল।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রায় সাহেব জগদানন্দ রায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যে কেবল এই বইখানার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, তিনি যারপরনাই পরিশ্রম করিয়া বইখানার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়া ইহার মুদ্রাঙ্কনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বইখানার প্রুফ-সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তক সরোজনলিনার উদ্দেশে উৎসর্গিত হইল। ইহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ "সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতি"র ভাণ্ডারে অর্পিত হইবে।

কলেক্টার কুঠি
হাওড়া
৬-৬-২৮

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

ভূমিকা

গ্রন্থকর্ত্রী স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর পরিচয়-প্রদান অনাবশ্যক। আজ বঙ্গদেশের নগরে ও গ্রামে বহু "মহিলা-সমিতি" তাঁহার স্মৃতি বুকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাধনা অনেকে করেন; কিন্তু সব সাধনায় সিদ্ধি হয় কই? যে সূত্রটি ধরিয়া পুণ্যাত্মা গ্রন্থকর্ত্রী সাধনা করিতেছিলেন, তাহা আজ বাঙলার নারীগণকে সখীত্বের ডোরে বাঁধিতে পারিয়াছে। ইহাকেই বলে সিদ্ধি। জীবনের মহাব্রত সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই ভগবান্ তাঁহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছেন সত্য; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সেই ব্রতধারিণী সাধ্বীর আশীর্ব্বাদই এখন তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মগুলিকে পূর্ণতা প্রদান করিতেছে। তাই মনে করি,—

"জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা;
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরু-পথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।"

এই কবি-বাক্যের সার্থকতা গ্রন্থকর্ত্রীর জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ মরিয়া গেলে ভৌতিক দেহের সহিত তাহার সকলি ধ্বংস হয়, একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। যন্ত্রের তার ছিঁড়িয়া গেলে যেমন যন্ত্রীর মহিমা লোপ পায় না, তেমনি দেহের অবসানের সঙ্গে দেহীর সকলি কথনও শেষ হয় না।

আমার বিশ্বাস পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থকর্ত্রীর এই মহৎ জীবনের পরিচয় তাঁহার এই পুস্তকে পাইবেন। জাপান ও য়ুরোপ ভ্রমণ-শেষ করিয়া যখন

তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার দিন-লিপিগুলি পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং পাঠ করিয়াই আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। সেই দিন-লিপির গুলি লইয়াই এই পুস্তক। তাই বলিতেছি, গ্রন্থকর্ত্রীর জীবনের পরিচয় পুস্তকের প্রতি পত্রে দেখা যাইবে।

দেশ-ভ্রমণে আজকাল অনেকে বাহির হইতেছেন, কিন্তু সরোজনলিনী যে আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাহা সকলের মধ্যে আছে কি না সন্দেহ করি। তাঁহার হৃদয়খানি ছিল স্থির শারদ আকাশের ন্যায় উদার, ক্ষুদ্রতাশূন্য এবং স্বচ্ছ। তাই তিনি ভ্রমণকালে যে সব দৃশ্য ও ঘটনা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এই পুস্তক তাহারি নিখুঁৎ প্রতিচ্ছবি। যাহা কুৎসিত, যাহা অনাচার, বাহিরের সহস্র ভদ্রাবরণের ভিতর দিয়াও তাহা তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছে। তিনি নির্ভীকভাবে সেগুলির দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার অবস্থা-বিশেষে প্রাপ্য প্রশংসা করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন নাই। যে সকল ঘটনা তাঁহার নারীহৃদয়ে আঘাত দিয়াছে, সেগুলিকে তিনি শত ধিক্কার দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—কাহাকেও খাতির করেন নাই।

গ্রন্থকর্ত্রীর আন্তরিক স্বদেশ-প্রীতির নিদর্শন যে, পুস্তকখানিতে কত আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। বিদেশের যে সকল অনুষ্ঠান দেশগুলিকে মহিমময় করিয়াছে, তাহার বিবরণ লিখিবার সময়ে স্বদেশের কথা মনে করিয়া তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছে। তিনি বারবার বলিয়াছেন,—"কেন আমাদের দুর্ভাগা দেশে এগুলির আয়োজন হইতেছে না?"

বাহিরের ঢাকঢোলের শব্দে এবং জনকোলাহলের মধ্যে দেশের ইষ্টদেবতার সন্ধান পাওয়া যায় না। সে দেবতা থাকেন দেশের অন্তঃপুরে যবনিকার অন্তরালে। বিদেশী পুরুষ-পর্য্যটকের সেখানে "প্রবেশ-নিষেধ"।

তাই তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেশের প্রাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গ্রন্থকর্ত্রী নারী এবং হিন্দুনারী। তাই তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানকার ঘরের খবর বাহির করিয়া এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। একজন প্রতিভাশালিনী বঙ্গমহিলা সমুদ্র-পারের এক উন্নত জাতির অন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেন, সব দিক্ দিয়াই তাহার মূল্য অতুলনীয়।

পুস্তকখানি সারগর্ভ, ভাবুকতাপূর্ণ এবং মৌলিক; কিন্তু ভাষার অযথা আড়ম্বরে ভারগ্রস্ত নয়। কোনো স্থানে ভাষার জড়তা দেখিতে পাই নাই। তাই ইহা সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রীর অনাবিল ভাবধারা তাঁহার লেখনী-মুখ হইতে স্বতঃ উৎসরিত নির্ঝরিণীর মতো তরতর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। এই অপূর্ব্ব পুস্তকখানি আমাদের বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবে মনে করি। পরিতাপের বিষয় এই যে, গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার রচনাগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

শান্তিনিকেতন,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

শ্রীজগদানন্দ রায়



সরোজনলিনী দত্ত

জাপানে বঙ্গনারী

সমুদ্র-পথে

১৭ই এপ্রিল (১৯২০) স্বামী ও পুত্র সহ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া (B. I.) লাইনের টাকাডা (Takada) জাহাজে জাপান ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। তখন বেলা তিনটা—কিন্তু প্রথমেই অযাত্রা। টমাস্ কুক্ কোম্পানীর জিম্মায় আমাদের যে মাল-পত্র দেওয়া হয়েছিল উট্রম্ ঘাটে এসে দেখা গেল যে, তারা সেগুলি ঘাটের কাছে এনে ফেলে গেছে মাত্র—জাহাজে পৌঁছিয়ে দেয় নি। বড় বিরক্তি ধর্‌লো। আমার স্বামী সেগুলি কুলির দ্বারা জাহাজে নেওয়ালেন। কিন্তু সব চেয়ে মজা হ'ল যে, আমরা জাহাজে পৌঁছবার পর কুক্ কোম্পানীর একটা লোক এসে জিনিষ জাহাজে পৌঁছে দেবার জন্য লম্বা বিল এনে হাজির কর্‌ল। আমরা অবশ্য আগেই কুলিকে পয়সা দিয়ে বিদায় করেছিলাম। কাজেই কুক্ কোম্পানীর লোককে শূন্য হাতে ফির্‌তে হ'ল।

জাহাজে একটা তিন-বার্থ ওয়ালা কেবিন ছিল। কিন্তু তিনটী প্রাণীর থাকার পক্ষে কেবিনটা অত্যন্ত ছোট। তা' ছাড়া তিনটী

বার্থের জন্য একটী ছোট ইলেকট্রিক ফ্যান্। গরমের জন্য এই অপ্রশস্ত ঘরটীতে প্রথমে বড় কষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে গেল। জিনিষ-পত্র কেবিনে রেখে আমরা উপরের ডেকে গেলাম।

এই জাহাজটীর নীচের তলার কামরাগুলি বাসের জন্য এবং পুরুষ ও মহিলাদের স্বতন্ত্র স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যে ঘরটী আছে সেটী কম্পানিয়ন্ (companion) ঘর। তার মধ্যে শুধু দুইটী জায়গা আছে। ইহার এক পাশে খাবার সেলুন; সেটীতে অনেকগুলি ছোট বড় টেবিল আছে। অন্য পাশে সঙ্গীতাগার বা সঙ্গীত-কক্ষ (music room)। ইহা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বস্‌বার ঘরস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই ঘরটীতে একটী পিয়ানো আছে, সেই জন্যই ঘরটীকে সঙ্গীত-কক্ষ (music room) বলে। তা ছাড়া সেখানে কয়েকখানি টেবিল ও চেয়ার আছে। যাত্রীদের পড়বার জন্য একটি আলমারিতে কতগুলি বইও আছে। এই ঘরে মহিলা-যাত্রীদেরই আধিপত্য বেশী, তাই এখানে চুরুট খাওয়া নিষেধ। এ ঘরটী ছাড়া পুরুষ-যাত্রীদের জন্য একটী ধূমপানাগারও (smoking room) আছে। এখানে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। তবে আজকাল অনেক মহিলা চুরুট খান, সে জন্য মাঝে মাঝে সেখানে তাঁদেরও আবির্ভাব হয় দেখলাম! ধূমপানাগার নাম হলেও সেখানে পুরুষ-যাত্রীদের সুরাপানেরও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। সব জাহাজেই যাত্রীরা নিজের আরাম কেদারা সঙ্গে আনেন, সেগুলি ডেকের উপরে রাখেন। যাত্রীরা সাধারণতঃ সমস্ত দিনটা ডেকের উপরেই কাটান। এ জাহাজেও সকলেই নিজের নিজের আরাম কেদারা এনেছেন। জাহাজের চেয়ার ডেকে বসবার জন্য একটীও নাই। ভোজনাগার, সঙ্গীত-কক্ষ ও ধূম-পানের ঘরের চারিদিকে বারাণ্ডার মত যে জায়গা আছে তাকেই ডেক্

বলে। সেখানে যাত্রীরা সর্ব্বদা বসেন, খেলা করেন কিম্বা চলা-ফেরা করেন। ডেকের উপরে তিন-চার রকম খেলার সরঞ্জাম আছে।



টাকাডা

এসেই প্রথমতঃ আমরা আমাদের কেবিনে গেলাম। সেখানে জিনিষ-পত্র রেখে উপরে এসে চা খাওয়া গেল। বেলা চারিটার সময় ডাইনিং সেলুনে গিয়ে চা পান করা এখানকার নিয়ম। চায়ের পরে ডেকে দাঁড়িয়ে মাল বোঝাই ও জাহাজ ছাড়বার সব বন্দোবস্ত দেখ্‌তে লাগলাম। যেখানে কুলিরা যাত্রীদের বড় বড় বাক্স হোল্ডে (hold) রাখছে হঠাৎ সে দিকে নজর গেল। প্রাণহীন বলে কুলিরা বাক্সগুলির উপরে যে নির্ম্মম ব্যবহার করচে, তা দেখে বড় কষ্ট হ'ল। আমাদের দুটি বাক্স ছিল, তাদের উপরও এই উপদ্রব হবে ভেবে আমার স্বামী কুলিদের দিয়ে বাক্সগুলিকে আমাদের কেবিনে আন্‌লেন। পরে ভাগ্যক্রমে সে দু'টিকে আমাদের কেবিনের কাছে একটা ছোট ঘরে রাখার সুবিধা হওয়ায় সেখানেই রাখা গেল। এই ছোট ঘরটাতে

সচরাচর যাত্রীদের বিশেষ দামী জিনিষ ও বন্দুক ইত্যাদি রাখা হয়। এবারে সে ঘরটি খালি আছে। তাই সেখানে আমাদের এবং আরও কয়েক জন যাত্রীর বাক্স রাখ্‌তে পারা গেল। রাত্রে বেশ ডিনার দিলে। দুটী টেবিল শুধু এসিয়া-বাসীদিগের জন্য পৃথক রাখা ছিল। আমরা তিন জন ও একজন জাপানি ভদ্রলোক তারি মধ্যে একটী টেবিল পেলাম। জাপানি লোকটী ভাল ইংরেজী বলেন না, তবুও আমার স্বামী তাঁর সঙ্গে আলাপ সুরু করিলেন। ইংরেজদের উপর তাঁর বিশেষ ভক্তি বুঝা গেল না। তিনি কথায় বার্ত্তায় বল্‌লেন, ইংরেজেরা অত্যন্ত দেমাকে। কল্‌কাতার কোনো সওদাগরি আফিসে ভদ্রলোকটী চাকরী করেন। তাই দু'চারটী বাংলা কথা শিখেছেন। তাঁর কল্‌কাতা খুব ভাল লাগে এবং বাঙ্গালী মেয়েকে বিবাহ করতে তাঁর সখ আছে, ইহাও জানা গেল।

কেবিনে বড় গরম; সেজন্য আমাদের ঘরের 'বয়কে' ডেকের উপর বিছানা আনতে বলে দেওয়া হলো এবং রাতটা আমরা তিন জনই ডেকে শুলাম। সমস্ত রাত জাহাজ চলতে থাকলো।

১৮ই এপ্রিল

১৮ই এপ্রিল সকালে বিছানা ছেড়েই দেখি, গঙ্গায় জল কম বলে জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুপুরে দু'চার ঘণ্টা চলেছিল কিন্তু বেশী দূর যাওয়া গেল না। এই দু'দিনে কাহারো সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় হয় নি। আমার ছেলের ঠাণ্ডা লেগে অল্প সর্দ্দি জ্বর হ'ল। তাই জাহাজের ডাক্তারের খোঁজ নিতে বাধ্য হলাম। সেই সূত্রে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি বোম্বেবাসী, নাম ডাক্তার কোঠারে। এত সুন্দর বাংলা বলেন যে, আমি তাঁকে প্রথমে বাঙ্গালীই ভেবেছিলাম। ইনি পরে সমস্ত রাস্তা আমাদের সাহায্য করেছিলেন। কল্‌কাতার কলেজে

পড়েছিলেন বলে ইনি এত ভাল বাংলা জানতেন। জাহাজে মহিলা-যাত্রীদের দেখা-শুনা করবার জন্য একটী ষ্টুয়ার্ডেস্ (stewardess)



ডেকের জীবন

আছেন। আমাদের ষ্টুয়ার্ডেস্‌টী বেশ লোক। তাঁর কাছে আমি অনেক সাহায্য পেয়েছিলাম। ইনি পুরো ইংরেজ; কিন্তু কয়েকটী বাঙ্গালী মহিলার সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তাই বাঙ্গালীদের আদব-কায়দা তাঁর অনেকটা জানা ছিল। এই গরমেও জাহাজে দিনে একবারের বেশী কোন যাত্রী স্নান করতে পেতেন না; কারণ স্নানের জন্য পরিষ্কার জলের অত্যন্ত অনাটন ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী মহিলারা যে স্নানের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, তা ষ্টুয়ার্ডেসের বেশ জানা ছিল; তাই তিনি আমার জন্য সকালে একবার এবং সন্ধ্যার সময় একবার স্নানের জলের বন্দোবস্ত করে দিতেন। আমার ছেলের অসুখেও এই বিদেশী মহিলার কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

১৯এ এপ্রিল

আজ সকালে আবার জাহাজ ছাড়লো। নদীতে জলাভাবে প্রায় একটা দিন জাহাজ চলেনি। ডায়মণ্ড-হারবারের দৃশ্য নাকি বড় সুন্দর। আমার কিন্তু সেটা দেখা হ'ল না। কারণ ছেলের অসুখের জন্য আমাকে সে সময় কেবিনে থাকতে হয়েছিল। এখন জাহাজ সমুদ্রের কাছে এসেছে। জাহাজ কেমন দুলছে। দুলুনি এত বেড়ে গেল যে, রাত্রে শোবার আগে কেবিনের পোর্ট্‌হোল্‌ বন্ধ করে দিতে হ'লো, কারণ তা' না হ'লে কেবিনেব ভিতরে জল আসত।

২০এ এপ্রিল

সকালে উঠে পোর্ট্‌হোল্‌ খুলে নীল সমুদ্রের দৃশ্য দেখ্‌তে লাগিলাম। মনটা বড় উৎফুল্ল হ'লো। এতক্ষণে মনে হ'লো যেন সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ হয়েছে। দু'দিন ধরে নদীতে যে রকম আটক পড়েছিলাম তাতে মনের উৎসাহ দমে গিয়েছিল। সকালে স্নান করতে গিয়ে দেখি জলটার একেবারে লোহার মরিচার মত রং হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, জাহাজ অত্যন্ত দুলেছিল সেজন্য জলের ট্যাঙ্কের (Tank) মরিচা জলে মিশে জাহাজের সমস্ত জল লাল করে দিয়েছে। এমন কি খাবার জলেরও সেই অবস্থা!

২১এ এপ্রিল

এই কয়েক দিনে অনেকগুলি যাত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। রাত্রে খাবার পর গ্রামোফোন্‌ বাজিয়ে প্রায় রোজ রাত্রে কয়েকটী ইংরেজ মহিলা নাচ্‌তেন। তাঁদের অদ্ভুত কাপড় ও অদ্ভুত ব্যবহার দেখে আমার কিন্তু অত্যন্ত খারাপ লাগ্‌ত। আমরা প্রায়ই সঙ্গীত-কক্ষে বেরসিকদের

দলে মিশে কোন একটা খেলায় যোগ দিতাম। রাত্রে মেয়ে-পুরুষদের ডেকে শোবার ব্যবস্থা আলাদা ছিল না, যে যেখানে পারত শুতো। ছুটী একটী এমেরিকান্ দম্পতির সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল, তাঁরাও এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখে হাসি ঠাট্টা করতেন।

২২এ এপ্রিল

চারিদিন আমরা সমুদ্র-বক্ষে চলেছি। সমুদ্রের দৃশ্যটী অতি চমৎকার! ছোট ছোট নীল ঢেউ কেটে জাহাজ চলেছে, আর চারিদিকে শুধু নীল জল। জাহাজে কিন্তু মাছির অত্যন্ত উপদ্রব। আবার রাত্রে গরমের উপদ্রব ভোগ করতে হচ্ছে। আজ থেকে জাহাজের গতির উপর বাজি রাখা আরম্ভ হলো। একজন মাতব্বর হয়ে যাত্রী সকলের কাছে টাকা আদায় করেন। এবং জাহাজ সে দিন কত মাইল পথ যাবে আন্দাজ করতে বলেন। তারপর যার আন্দাজের কাছাকাছি জাহাজ ২৪ ঘণ্টায় চলে, সে পুরস্কার পায়। তিনটী পুরস্কার দেওয়া হবে। আমরা ২৲ টাকায় দুখানি টিকিট কিন্‌লাম এবং ভাগ্যক্রমে আমিই দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲ টাকা পেয়ে গেলাম। সুতরাং তিনটী টাকা আজ লাভ হলো।

২৩এ এপ্রিল

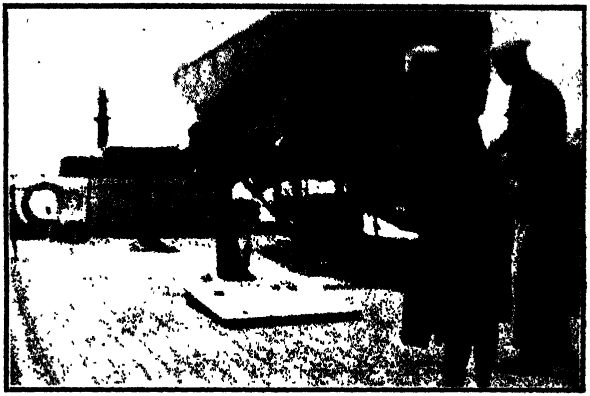
আজ সকালে দূরে আণ্ডামান দ্বীপ দেখা গেল। ক'দিন খালি জল দেখার পর ডাঙ্গার দৃশ্যটী বড় চমৎকার লাগ্‌লো। তারপর আরও অনেকগুলি পাহাড় দেখা দিল, সেগুলি মালয় উপদ্বীপের সংলগ্ন কয়েকটী দ্বীপ। সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতে আমাদের আর বেশী দেরী নাই—সেজন্যে ক'দিন দেশের জন্য অনেক চিঠি লিখ্‌লাম। সিঙ্গাপুরে সেগুলি ডাকে দিতে হবে। জাহাজে ব্যায়াম করবার বেশী সুবিধা পাওয়া যায় না; প্রায় সকলেই

ডেকের উপর পায়চারি করে—তা' ছাড়া দুচার রকম খেলাও জাহাজে আছে, তার মধ্যে একটার উল্লেখ করছি। এই খেলাটা আমরা প্রায় খেলতাম—খেলাটার নাম, 'বুলবোর্ড'। একটা কাঠের বোর্ডের উপর দুটো গরুর ছবি থেকে ১, ২, ইত্যাদি করে দশটা সংখ্যা লেখা আছে। সেই বোর্ড থেকে চার পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ছয়টা বালি পোরা চেপ্টা বল্ দিয়ে বোর্ডের নম্বরের উপর নিশান করে মারতে হয়। এক থেকে আরম্ভ করে দশ পর্য্যন্ত ও তারপর গরুর মাথার ছবিতে যে আগে মারতে পারে তার জিত হয়।

২৪এ এপ্রিল

আজ দূরের পাহাড়গুলা স্পষ্ট দেখা গেল। দূরবীনে পাহাড়ের উপরকার গাছপালা পর্য্যন্ত দেখা যেতে লাগ্লো। ষ্টুয়ার্ডেস্ ডেকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁকে বল্লাম, জাহাজটার চারিদিকে ঘুরে দেখতে চাই! তিনি আমাকে ডাক্তারের কেবিন, তাঁর নিজের কেবিন, বোতল-খানা ও অন্যান্য দু চারটা কেবিন দেখালেন। ষ্টুয়ার্ডেস্ লোকটি বেশ। তিনি আমার সাড়িগুলোর বড় প্রশংসা করেন। জাহাজে অন্য অনেক বিলাতি মহিলারাও আমার সাড়ি দেখে মুর্চ্ছা যান! তাঁদেরও সাড়ি পরতে বড় ইচ্ছা; কিন্তু পরাধীনের পোষাক বলে পরেন না। মেয়ে-যাত্রীদের দুটো স্নানের ঘর আছে। একটা বেশ বড় ও তাতে 'পোর্টহোল্' (গোল ছিদ্রাকার জানালা) আছে বলে বেশ ঠাণ্ডা থাকে। আমার ভাগ্যে ভালটাই পড়্ত। কারণ আমি ষ্টুয়ার্ডেসের সুনজরে পড়েছিলাম। বাঙ্গালী-অভ্যাস মত আমি দুবার করে স্নান করি। এতে আমি মনে করেছিলাম, ষ্টুয়ার্ডেস্ গোল করবেন; কিন্তু তা না হ'য়ে বরঞ্চ সে জন্যে আমি তাঁর কাছে প্রশংসনীয়া হয়ে পড়্লাম। তিনি বল্তেন, 'আমি

আমাদের দেশের মহিলাদের বলি যে, আমরা ভারতবর্ষে এসে পরিষ্কার হতে শিখেছি।'



বুলবোর্ড খেলা

২৫এ এপ্রিল

আজ রবিবার। যে কয়জন মিশনারি ছিলেন তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাবার ঘরে সকালে উপাসনা করলেন। আমাদের জাহাজে মিশনারির সংখ্যা অনেক। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাঁরা ছাড়া অন্য যাত্রীদের অনেকেই উপাসনায় যোগ দিলেন না। ডিনারের পর যা দেখ্‌লাম সেটা আশ্চর্য্য করলে। আমরা আহারের পরে বাজনার ঘরে যেতেই মিসেস্ ব্রেস্‌লার (ইনি একজন এমেরিকান্ মহিলা; ইহাঁর স্বামী Y. M. C. A-তে কাজ করেন) বাজনার কাছে গিয়ে বাজনা বাজাতে লাগ্‌লেন, এবং আরও কয়েক জন মহিলা রবিবার ব'লে হিম্ (ধর্ম্ম-সঙ্গীত) গাইবার প্রস্তাব

করলেন। ঘরের মধ্যের একদল সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং ধর্ম্মসঙ্গীত আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অন্যদলের তা সহ্য হ'ল না; তাঁদের যে কয়টা লোক ঘরে ছিলেন, তাঁরা সুড়্ সুড়্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে 'ডেকে' চলে গেলেন। কিন্তু যাঁরা হিম্ গাইছিলেন তাঁরা একটা গেয়ে ক্ষান্ত হলেন না; আবার গাইতে লাগিলেন ও পাঁচ ছয়টা হিম্ গাইলেন। ওদিকে ধর্ম্মসঙ্গীতের বিরোধীরা কিন্তু চোটে গিয়ে 'হিমে' বাধা দিতে আরম্ভ করলেন। এইদলের একটা মেয়ে জাহাজে নাচ্‌বার জন্যে একটা গ্রামোফোন্ সঙ্গে এনেছিল। মেয়েটা এমন অভদ্র যে, ধর্ম্মসঙ্গীত গাওয়ার সঙ্গে তার গ্রামোফোন্ 'ডেকে' এনে নাচের বাজনা আরম্ভ করে দিল। তার অবশ্য আরও সঙ্গী ছিল—তারা কিন্তু বেশীর ভাগই পুরুষ। একটু পরে একজন পুরুষ গ্রামোফোন্-ওয়ালাদের গিয়ে বল্‌লেন, 'মশায়, ঘরের মধ্যে মহিলারা ভগবানের নামে গান গাইছেন, এখন গ্রামোফোন্‌টা অনুগ্রহ করে বাজাবেন না।' কিন্তু তার উত্তরে তিনি শুনিলেন, 'ঘরে যে রকম বাজনা হচ্ছে, ওতে জাহাজ ডুবে যাবে।' এ সব কাণ্ড দেখে মনে বড় বিতৃষ্ণা হলো। খানিক পরে ধর্ম্ম-সঙ্গীত থেমে গেল। অমনি অন্যদলের একজন মহিলা কতকগুলো পুরুষকে নিয়ে পিয়ানোতে প্রেমের গান আরম্ভ করে দিলেন। ধর্ম্মসঙ্গীত-গায়িকারা শুতে গেলেন। এ সব কাণ্ড দেখে আমরা ত অবাক্ হয়ে গেলাম।

সিঙ্গাপুর

২৬এ এপ্রিল

সকালে যখন উঠ্‌লাম তখন জাহাজ আর চল্‌ছে না। পোর্টহোল্ থেকে মুখ বাড়াতেই মনে হ'লো, যেন একটা ছবি দেখ্‌ছি। সুন্দর পাহাড়; তার উপরে কয়েকখানি সুন্দর বাড়ী। নীচে সমুদ্র, তার উপর সারি সারি জাহাজ ভাস্‌ছে—দৃশ্যটী সত্যই অতি চমৎকার। আমরা সিঙ্গাপুরে এসেছি। ষ্টুয়ার্ডেস্ এসে বল্লেন, ডাক্তার এসে আমাদের পরীক্ষা কর্‌লে জাহাজ সিঙ্গাপুরের বন্দরে ঢুক্‌তে পাবে। সিঙ্গাপুর থেকে যে ডাক্তার এসেছিলেন তিনি কিন্তু শুধু ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ই খেলেন। তা' ছাড়া তাঁকে আর কিছু করতে দেখলাম না। শুন্‌লাম জাহাজের ডাক্তারের কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছেন, তাই আলাদা করে পরীক্ষা কর্‌লেন না। যে ডাক্তারটী এসেছিলেন তিনি নিজের মোটর বোট্ করে চলে গেলেন। আমাদের জাহাজ বন্দরে গিয়ে ঢুক্‌লো। বন্দরে আস্‌তেই প্রথমে কতক-গুলো সিঙ্গাপুরি লোক ছোটো ডিঙ্গির মত নৌকাতে জাহাজের পাশে এসে ভিক্ষা কর্‌তে কর্‌তে জাহাজের সঙ্গে যেতে লাগ্‌ল। আমরা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। এদের দিকে মাঝে মাঝে আমরা দু একটা পয়সা ফেলে দিতে লাগ্‌লাম। পয়সাগুলোর প্রায় সবই জলের মধ্যে পড়্‌ছিল; কিন্তু এই লোকগুলো অতি নিপুণ কৌশলে জলের মধ্যে ডুব দিয়ে পয়সা তুলে নিচ্ছিল। ছেলেবেলায় যখন আমি বাবার সঙ্গে বিলাতে যাই তখন এ রকম ডুবারি ভিক্ষুক দেখেছিলাম। সে জন্য আমার কাছে ইহা বিশেষ নূতন মনে হ'লো না। তবে এদের কৌশল সত্যই

অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। যেখানেই পয়সা ফেলে দাও ঠিক পয়সাগুলোর সঙ্গে ডুব দিয়ে এরা পয়সাটা তুলে আন্‌বেই। জাহাজ আস্তে আস্তে বন্দরে পৌঁছিল। পৌঁছিতেই একজন ইংরেজ অফিসার জাহাজে এসে আমাদের সকলের পাসপোর্ট্ পরীক্ষা কর্‌লেন। তিনি পুরুষদের চুরুট্‌খাবার ঘরে (smoking room) বস্‌লেন। আমরা সকলে সেখানে পাসপোর্ট্ নিয়ে হাজির হলাম—তিনি প্রত্যেকটা পাসপোর্ট্ দেখে তার উপর এক একটা ষ্ট্যাম্প করে দিলেন! আমরা একে একে ষ্ট্যাম্প-মারা পাসপোর্ট্ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বন্দরে জাহাজ দাঁড়াতেই অত্যন্ত গরম লাগ্‌ছিল. সে জন্যে আমরা স্থির কর্‌লাম, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সিঙ্গাপুর সহরটা দেখ্‌তে যাবো। আমাদের সহযাত্রীদের অনেকেই মধ্যাহ্ন ভোজনের আগেই নেবে সিঙ্গাপুর দেখ্‌তে গেলেন। তাঁরা সেখানেই হোটেলে টিফিন্ খেলেন। জাহাজে টিফিনের সময় অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। আমরা তিনটার সময় ডাঙ্গায় গেলাম। সিঁড়িটা এমন খারাপ করে রেখেছিল যে, অতি সাবধানে নাম্‌তে হলো। প্রথমে কতকগুলো জাহাজের মালের গুদাম-ঘর পার হয়ে রাস্তায় এলুম। সেখানে কতকগুলো রিক্‌সা, ঘোড়ারগাড়ি ও মোটর ছিল। রিক্‌সাগুলি এক একটা চীনালোক টেনে নিয়ে যায়। ঘোড়ার গাড়ীগুলো দেখতে আমাদের দেশের পালকী গাড়ীরই মত। তবে শুধু একঘোড়াতে টানে—এগুলি কতকটা আমাদের দেশের শামপুনি ও ঠিকেগাড়ির মাঝামাঝি রকমের। দেখ্‌তে বেশ ভালই মনে হলো। দুপুর রোদে রিক্‌সাতে যেতে ইচ্ছা হ'ল না। আবার মোটরের ভাড়া ঘণ্টায় চার টাকা, তাই বাধ্য হয়ে ঘোড়ার গাড়ীই নিলাম। আমাদের সঙ্গে দেশী টাকা ছিল। এদেশে 'ডলার' ও 'সেণ্ট্' ব্যবহার হয়, সে জন্যে প্রথমেই আমরা কিছু টাকা বদলাতে ব্যাঙ্কে গেলাম।

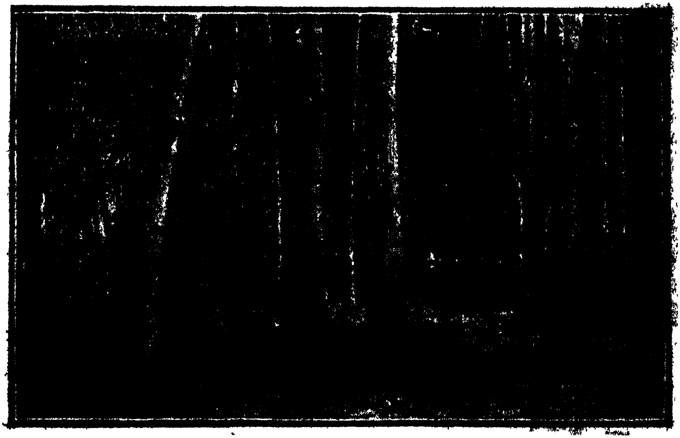
আমাদের একশত টাকা এখন ওদের ৯৩ ডলার। ১০০ সেণ্টে এক ডলার হয়। তাহলে এক টাকা এক ডলারের কিছু কম পড়্‌ল। ব্যাঙ্কে যেতেই সেখানকার লোকেরা বল্লে, তিনটের সময় টাকা বদ্‌লান বন্ধ হয়ে গেছে। আমার স্বামী তুজন চীনে ফেরাণীকে বল্লেন যে ওঁর কাছে দেশী টাকা আছে বদ্‌লাতে চান, বিশেষ দরকার; কিন্তু তারা কোন সাহায্য কর্‌লে না। তখন ম্যানেজারের কাছে যেতে হলো—ম্যানেজারটি ইংরেজ। ইনি উঠে এসে টাকার দর বলে দিলেন, আর বল্লেন, ব্যাঙ্ক্‌ বন্ধ হয়ে গেছে সুতরাং টাকা বদ্‌লাতে হলে Whiteway Laidlaw-র দোকানে যেতে হবে। তার আগেই বাইরে তু তিন্‌টে লোক ৯৩ ডলারে ১০০৲ টাকা দরে দেবে বলছিল। জাহাজে কিন্তু একটা টাকা বদ্‌লান-ওয়ালা এসে ১০০৲ টাকায় ৯৫ ডলার দিচ্ছিল। আমরা তখন অতি লোভ কর্‌তে গিয়েছিলাম, মনে করেছিলাম ব্যাঙ্কে আরও সুবিধা পাওয়া যাবে। সেজন্তে টাকা বদ্‌লান-ওয়ালাদের কাছে টাকা নিই নি। Whiteway-র দোকানে ওরা একশত টাকার বদলে নব্বই ডলার দিবে বল্লে। তখন তাড়াতাড়ি বাহিরে এসে সেই টাকা বদ্‌লান-ওয়ালার শরণাপন্ন হতে হলো। সেখানে ৪০-টী টাকা বদ্‌লে নিয়ে Whiteway-র দোকানে তু একটা জিনিষ কিনে নিলাম। সেখান থেকে Hotel de Europe-এ গিয়ে চা খেলাম। কিন্তু দাম ভয়ানক বেশী, এক পেয়ালা চা ও এক টুক্‌রা রুটি মাখনের জন্তে দশ-বারো আনা নিলে, তা ছাড়া কেকের আলাদা দাম দিতে হলো। তারপর আমরা বোটানিকেল্ গার্ডেনে গেলাম। এই বাগান সিঙ্গাপুরের একটা দর্শনীয় জায়গা। জাহাজ থেকে নেবে আমরা যে গাড়ী নিয়েছিলাম সেটা Whiteway-র দোকানে নেমে ছেড়ে দিয়েছিলাম; সেখান থেকে দুখানা রিক্সা নেওয়া গেল। বোটানিকেল্ গার্ডেন্‌টা অনেকটা দূরে।

রাস্তায় একটা দোকানে অনেক রকম শিল্পদ্রব্য (curio) ছিল। দোকানে যাওয়া গেল কিন্তু সেখানে চীনদেশের তৈরী জিনিষ ছাড়া স্থানীয় জিনিষ কিছু ছিল না। একটা চীনে পাত্র সাত ডলার দিয়ে কেনা হলো। দোকানে একটি চীনে মেয়ে আমাদের জিনিষ দেখাচ্ছিল। মেয়েটী কিছু ইংরিজি বল্‌তে পারে। বেশ পরিষ্কার কাপড় পোরেছে। মাথার চুল খুব টেনে বেঁধে পিছনে খোঁপা করেছে ও তাতে আবার গহনা লাগিয়েছে। মেয়েটার রং বেশ ফর্‌সা; বয়স আন্দাজ কুড়ি বাইশ হবে। পরনের কাপড় অদ্ভুত রকমের; একটা রেশমের লুঙ্গীর মত আছে; তারি উপরে একটা কোর্ট, সামনে ব্রুচ্‌ দিয়ে এঁটে রেখেছে। সিঙ্গাপুর সহরটা চীনেলোকে ভরা। প্রায় সবাই চীনে। অনেক টাকাওয়ালা চীনেও আছে। মোটরে অনেক চীনে ভদ্রমহিলা বেড়াতে যাচ্ছেন দেখলাম। ওঁদের পর্দা নাই। সবাই বেশ সাজসজ্জা করে খোলা মোটরে বেড়াতে যাচ্ছে। সিঙ্গাপুরের রাস্তাগুলো কিন্তু বেশ পরিষ্কার ও খুব ভাল! দোকানগুলোতে প্রায় সবই চীনে ভাষায় প্লাকার্ড লেখা ও অনেক দোকানে চীনেদেরই ব্যবহার্য্য জিনিষ রয়েছে। ইংরিজি দোকানও আছে। শিল্পদ্রব্যের দোকান থেকে আমরা বোটানিকেল্ গার্ড্রেনে গেলাম। তখন অন্ধকার হয়ে আস্‌ছিল তাই বেশী কিছু দেখা গেল না। আমরা একটু ঘুরে বেড়িয়ে রিক্সা করে জাহাজের কাছে ফিরে এলাম।

২ শএ এপ্রিল

আজ প্রাতর্ভোজনের পরই আমরা আবার সিঙ্গাপুর সহর দেখ্‌তে বেরুলাম। ইংরেজদের বিবেচনায় সিঙ্গাপুরের 'Little'-এর দোকানটা নাকি একটা দেখ্‌বার জিনিষ। আমাদের কাপ্তেন্ বল্লেন, সেটা আমাদের দেখা উচিত। তা ছাড়া সিঙ্গাপুরের মিউজিয়াম্‌টাও আমাদের দেখা

হয় নি। শুন্‌লাম্, সেখানে একটা প্রকাণ্ড তিমি মাছের হাড় আছে। জাহাজ থেকে নেমে প্রথমে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে মিউজিয়ামে গেলাম। সেখানে কিন্তু কলিকাতার মিউজিয়ামের মত কিছুই নেই। তবে অনেক রকমের সমুদ্রের মাছ সংগ্রহ করা আছে। তা ছাড়া তিমি মাছটা সত্যই দেখ্‌বার জিনিষ। সেটা প্রায় বায়ান্ন ফিট্ লম্বা। মিউজিয়াম দেখে আমরা Little-এর দোকানে গেলাম। সেটা কতকটা আমাদের কলকাতার Whiteaway ও Peliti-র দোকান, এই দুইয়ের সমাবেশ। দরকারি জিনিষ কিন্‌তে পাওয়া যায়, আবার তার সঙ্গেই একটা প্রকাণ্ড বড় খাবার ঘর আছে। লোকে সর্ব্বক্ষণই সেখানে অন্ততঃ সরবত্, আইস্‌ক্রিম্ ইত্যাদি কিছু না কিছু খাচ্ছে আর বাজনা শুন্‌ছে। এটা



রবার গাছের বাগান.

হলো ইংরেজদের ক্রীড়াস্থল। আমরা সেখানে গিয়ে তিন জনে তিন গ্লাস্ সরবত্ খেলাম। খড়ের নল দিয়ে চুষে সরবত খেতে হয়।

আমার ছেলের এটা খুব পছন্দ হয়েছিল। সে দুটো খড়ের নল হাতে করে নিয়ে এলো। রিক্‌সা বা ঘোড়ার গাড়ীতে সিঙ্গাপুর জায়গাটা ভাল করে দেখ্‌বার সুবিধা হ'ল না। তাই বিকেলে চারিটার সময় জাহাজের ডাক্তারকে নিয়ে আমরা মোটর করে একবার সিঙ্গাপুরটা দেখে নেব স্থির কর্‌লাম। রাস্তায় গিয়ে কিন্তু মোটর দেখ্‌তে পাওয়া গেল না, তাই অগত্যা দুখানা বড় রিক্‌সা ভাড়া করা গেল, রাস্তায় মোটর পেলেই নেওয়া যাবে স্থির করে বেরুলুম। কিন্তু রাস্তায় মনোমত মোটর পাওয়া গেল না। শেষে একটা মোটরখানা থেকে বেশী দাম দিয়ে মোটর নেওয়া গেল। রিক্‌সা কুলিগুলো চীনে। তাদের উনি ৫০ সেণ্ট্‌ করে দিলেন, কিন্তু কেবল ২৫ সেণ্ট্‌ তাদের প্রাপ্য ছিল। তবু তারা ভয়ানক রাগারাগি কর্‌লে। কোন প্রকারে তাদের এড়িয়ে মোটরে ত চড়া গেল। গভর্ণরের বাড়ির হাতার ভিতর দিয়ে বোটানিকেল্‌ বাগানে যাবার রাস্তা। দূর থেকে গভর্ণরের বাড়ি দেখা গেল। বোটানিকেল্‌ বাগানটা আমরা প্রথম দিন ভাল করে দেখিনি। সত্যই মোটরে ঘুরে না দেখ্‌লে তার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। অনেকগুলি বোটানিকেল্‌ বাগান দেশে দেখেছি, কিন্তু এটা সত্যই একটা সৌন্দর্য্যের আধার। পাহাড় জল গাছ ও সবুজ ঘাস দিয়ে যেন ছবি এঁকে রেখেছে। মনে হয় যেন, কোন পরীর বাগান। অন্য কোন বোটানিকেল্‌ বাগানে এত সুন্দর রাস্তা দেখিনি, রাস্তাগুলি সুন্দর ভাবে এঁকে বেঁকে গেছে। বোটানিকেল্‌ বাগান থেকে আমরা একটা রবার গাছের বাগানের কাছে গেলুম। এদেশে রবারের খুব চাষ আছে। রবারের গাছগুলো খুব বড়। গাছের গুঁড়ির মত এক এক জায়গা চিরে তার ঠিক নীচে একটা ছোট টীনের পাত্র বেঁধে দেয়। সেই পাত্রে চেরা জায়গা থেকে দুধের মত সাদা আঠা পড়ে। সেটা [illegible] পরেই জমে গিয়ে রবারের মত পদার্থ হয়। রবারের বাগানটার [illegible]

দিয়ে গ্যাপ্ (Gap) বলে একটা জায়গায় গেলাম। এটা হচ্ছে সিঙ্গাপুরের সর্ব্বোচ্চ স্থান। মোটর কিন্তু একেবারে উপরে গেল। সুন্দর রাস্তা আছে। উপর থেকে সমুদ্রের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। সিঙ্গাপুর জায়গাটা খুব উঁচু নীচু। রাস্তায় কতগুলি চীনে গ্রাম দেখা গেল। গ্রামের বাড়িগুলির দেয়াল কাঠের ও ছাপ্পরগুলি নারিকেল বা তাল গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া। আমাদের দেশের মত তাদের ঘরের কাছে গরু বাছুর বাঁধা রয়েছে। গাই বলদগুলি কিন্তু বেশ বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট। এখানে খুব ঘাস হয়। চারদিক সবুজ হয়ে আছে; এই কারণেই বোধ হয় এদের গরু বাছুর আমাদের দেশের চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে। সিঙ্গাপুরে বৃষ্টির মাত্রা কিছু বেশী। সে জন্যে জায়গাটা একটু স্যাঁৎসেঁতে; তাই বেশীর ভাগ বাড়ি লোহার থামের উপর তৈরী করা হয়। বাড়ির ভিত্তিও খুব উঁচু থাকে। বাড়িগুলি দেখ্‌তে কিন্তু বড় সুন্দর। বিশেষতঃ চীনেদের বাড়িগুলো। চীনেদের মধ্যে যারা খুব ধনী তাদের বাড়ীর ফটকের উপর দুই থামে দুটো চিল প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। "গ্যাপ্" দেখে আমরা সিঙ্গাপুরের বৃহৎ জলাশয় (reservoir) অর্থাৎ যেখান থেকে খাবার জল সমস্ত সহরে আসে—সেটা দেখ্‌তে গেলাম। সে জায়গাটাও অতি মনোরম। খুব বড় একটা পুকুর; পুকুরের চারদিকে সুন্দর ফুলের বাগান; দূরে পাহাড় ও জঙ্গল। এ জায়গাটার দৃশ্য অতি সুন্দর। এ দেশের বাগান মাত্রেই চমৎকার। আমাদের সঙ্গে জাহাজের ডাক্তার আসায় জায়গাগুলা বেশ ভাল করে দেখা গেল। ইনি আগে সিঙ্গাপুরে এসে-ছিলেন; সে জন্যে তাঁর দেখবার মত জায়গাগুলি জানাছিল। ফিরবার সময় কয়েকটা আনারস কিনে আন্‌লুম। এখানে খুব আনারস বিক্রি করতে দেখা গেল। সিঙ্গাপুরের আনারস বিখ্যাত শুনা ছিল।

চীন-সমুদ্রে

২৮শে এপ্রিল—

আজ সকালে আমাদের জাহাজে প্রায় দুই হাজার চীনে "ডেক্" পেসেঞ্জার হয়ে উঠ্‌লো। নীচের "ডেক্" কানাত দিয়ে ঢেকে তাদের থাক্‌বার জায়গা হলো। এত চীনের সম্মিলনে যে কি রকম গোলমাল হচ্ছিল তা যাঁরা কয়েকটী চীনেকে একত্রে দেখেছেন তাঁরা ছাড়া কেউ বুঝ্‌বেন না। চীনেরা আমাদের দেশের লোকেদের মতই ভয়ানক চীৎকার করে কথা বলে। আজ সকালে জাহাজ সিঙ্গাপুর ছাড়্‌লে। এখানে দুচারটী ইংরেজ যাত্রী উঠ্‌লো। এতদিন আমাদের টেবিলে একজন জাপানি ছিল; কিন্তু আজ থেকে একজন নূতন ইংরেজ দম্পতিকে আমাদের সঙ্গে বসানো হোল ও জাপানি ভদ্রলোকটী অন্য এসিয়াটীক্ টেবিলে খেতে বস্‌লেন।

আজ জাহাজের গতির উপর বাজি রেখে যে লটারি হলো, তাতে আমার স্বামী ৫ ডলার দ্বিতীয় পুরষ্কার পেলেন—জাহাজে ওঠার পর আমরা এই দুবার পুরষ্কার পেলাম; দুবারই কিন্তু দ্বিতীয় পুরস্কার। চীনে যাত্রীরা এসে অবধি বড়ই মুস্কিল হয়েছে—তারপর এত লোক হওয়ায় সেদিক থেকে ভয়ানক দুর্গন্ধ আসছে—তারা হংকংএ নেবে যাবে সেই যা একটা মহাভাগ্যি!

১লা মে—

সকালে ভয়ানক গরম হচ্ছে। আমরা চীনসাগরে এসে পড়েছি। এত গরম যে, কেবিনে টেঁকা শক্ত। সমুদ্রের জলে হলদে রঙের গুঁড়ো

গুঁড়ো জিনিস ভাসছে। আমরা সেগুলাকে সেওলা বা অন্ত কোন ময়লা জিনিস ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে জানা গেল, হলদে গুঁড়োগুলি মাছের ডিম। সমুদ্রের মাছগুলি জলের উপর ডিম পেড়ে দিয়ে যায়। ঢেউ ও রোদের সাহায্যে ডিমগুলি থেকে বাচ্চা হয়।

২রা মে—

আর একটা রবিবার এসে পড়্‌লো। আজও উপাসনা হলো। এবারে কিন্তু অনেকে গিয়ে যোগ দিলে। দুপুরে আমি কেবিনে বিশ্রাম করতে ঘুমিয়ে পড়েছি, ঘুমের মধ্যে হঠাৎ আমার ছেলে এসে বল্‌লে "বাবা তোমায় উপরে ডাক্‌ছেন, জাহাজ ঘুর্‌ছে।" ঘুমের মধ্যে তার কথাগুলি ঠিক করে শুনিনি। আমি ভাব্‌লাম, সে কি বুঝ্‌তে কি বুঝেছে। জাহাজ আবার কেন ঘুর্‌বে! আমার ছেলে আবার উপরে চলে গেল। আমার কিন্তু আর ঘুম হোল না। তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই পোর্টহোল্‌ দিয়ে ঘরে জল আস্‌ছিল। আমি উঠে পোর্টহোল্‌ বন্ধ কর্‌ছি এমন সময় জলে একটা কিছু পড়্‌বার মত ঝপ্‌ করে শব্দ হলো। তারপর ডেকে খুব দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুন্‌লাম। জাহাজটাও থাম্‌লো। আমাদের পোর্টহোলের ঠিক উপরে যে একটা ছোট নৌকো টাঙ্গান থাক্‌ত সেটা নাম্‌তে লাগল। তখন আমার মনে হোল, কেউ বুঝি জলে পড়ে গেছে। মনটা প্রথমে একটু উৎকণ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো যে কাল আমার স্বামী বলেছিলেন, একটা পাগল চীনে ডেক্‌-যাত্রী আছে সে কাল একবার জলে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করেছিল। আর একজন চীনে যাত্রী জুয়া খেলে হেরে গিয়ে নিজের মাথায় নিজেই ছোরার আঘাত করেছিল। আমি মনে কর্‌লাম, নিশ্চয়ই এদের একজন জলে ঝাঁপ দিয়েছে। তখনই আবার আমার ছেলে দৌড়ে এসে বল্লে "মা, একটা লোক জলে পড়ে গেছে; বাবা ও মিঃ ড্রেস্‌লার রাগ কর্‌ছেন, কারণ জাহাজের

লোক নৌকো নামাতে দেরি করছে ; বাবা তোমায় উপরে ডাকছেন।" তখন আমি তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে দেখি, জাহাজের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর দল ডেকে বেরিয়ে ভিড় করে যে-লোকটা জলে পড়েছে তাকে দেখছে। তখনও প্রাণ রক্ষার জন্য যে ছোট নৌকা আছে সেটা নামান হয়নি ; তবে জীবন রক্ষার জন্য যে গোল বেল্ট্‌গুলো জাহাজে বেঁধে রাখা হয়, তার একটা জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেটা ভাসছে। তাতে একটা আলো বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যাতে সেটা দূর থেকে সহজে নজরে পড়ে। দেখলাম জাহাজের পিছনে যে চাকা আছে তার কাছেই একটা চীনে লোক জলে ভাসছে। তখনও বেশ জোরে বৃষ্টি পোড়্‌ছে! আমি লোকটাকে দেখেই মনে করেছিলাম সে বুঝি মরে গেছে ; কিন্তু সবাই বল্লে মরেনি। লোকটা জলের মধ্যে ভাসছিল, সাঁতার জানত তাই ডুবে যায়নি। নৌকো যখন নাবালে তখন তাতে ৪ জন খালাসি ও চিফ্‌-অফিসার ছিল। কিন্তু খালাসিগুলো তাদের কাজে ভালরূপে অভ্যস্ত ছিল না। তারা প্রথমে নৌকো টান্‌তেই ভয়ানক দেরি করছিল। চিফ্‌ অফিসারের কাছে মার খেয়ে তবে নৌকো চালালে। নৌকোটা যখন চীনে লোকটার কাছে গিয়ে তাকে তুলে নিলে তখন সে চোখ খুলে জাহাজের উপরের দিকে যাত্রীদের দিকে চেয়ে চুপ করে জলে ভাসছিল। তাকে যখন জাহাজে তোলা হোল, তখন সে একেবারে উলঙ্গ। তাই আমরা যত মহিলা যাত্রী ছিলাম প্রায় সকলেই নীচে বা ঘরে চলে গেলাম। চীনে লোকটা ভাগ্যক্রমে হাঙ্গরের গ্রাস থেকে বেঁচে গেছ্‌ল। চিফ্‌ অফিসার বল্লেন, সমুদ্রের এই জায়গায় অনেক হাঙ্গর আছে। লোকটা যদিও এক্ষেত্রে বাঁচলো, কিন্তু পরিশেষে ঠাণ্ডা জলে এতক্ষণ থাকার ফলে সে পরদিন মারা পড়্‌লো। সেই মৃতদেহ জাহাজে নিয়ে হংকং পর্য্যন্ত আমরা এসেছিলাম, অথচ ডাক্তার আমাদের কিছুই জান্‌তে দেয়নি।

মৃতদেহ জাহাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে পাছে যাত্রীদের মনে কোন রকম ভয় হয় এজন্যে হংকং ছাড়্‌বার পর ডাক্তার আমাদের কাছে এ খবর জানিয়েছিলেন। লোকটার মাথা গোলমাল ছিল বলে সে আত্মহত্যা করবার জন্যে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

ডাক্তার আমাদের নীচের "ডেকে" চীনে যাত্রীদের দেখ্‌বার জন্যে নিয়ে গেলেন। ওদের দেখ্‌বার জন্য আমার স্বামীর অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছিল। এখানে প্রায় দুই হাজার চীনে মেয়ে পুরুষ একত্রে রয়েছে। কেউ বসে আছে, কেউ খাচ্ছে। তাদের খাদ্য অনেক রকমের কিন্তু ভাতই প্রধান খাদ্য; সঙ্গে নানারকমের তরকারি থাকে, রান্না ঘরটাও দেখা গেল—চীনেরা আমাদের দেশের লোকের মত ভাতভোজী। রান্না ঘরে পাচকেরা রান্না কর্‌ছে। এক জায়গায় একটী চীনে মেয়ে তার পা বেঁধে জুতো পর্‌ছিল। তার পা চার পাঁচ বৎসরের মেয়ের মত। ছোট বেলায় পা দুটোকে খুব জোরে এঁটে বেঁধে রাখায় আঙ্গুলগুলি মুচ্‌ড়ে ভিতর দিকে চলে গেছে, পা আর বাড়্‌তে পারেনি। সে অতি যত্নে তার সেই ছোট দুটী পায়ের সেবায় রত ছিল। আমরা দাঁড়িয়ে তার পা বাঁধার কায়দা দেখ্‌লাম। পাকে একটা সরু কাপড়ের টুক্‌রা দিয়ে বেশ করে ব্যাণ্ডেজ্‌ ধরণে বেঁধে তার উপর মোজা পর্‌লে। তার উপরে আবার এক জোড়া ছোট্ট কাপড়ের জুতো পর্‌লে। আমরা তার এই সাজসজ্জা দেখ্‌ছি দেখে তার বেশ স্ফূর্ত্তি হলো; সে হাস্‌তে লাগ্‌ল। ওদের এই পা বাঁধা রীতি পৃথিবী-বিখ্যাত। তবে আজ কাল ওরা এ রীতি ওদের সমাজের অনিষ্টকর বলে বুঝ্‌তে পেরেছে। সে জন্যে সংশোধনের চেষ্টা কর্‌ছে ও আজকাল ছোট মেয়েদের প্রায়ই পা বাঁধে না। এই চীনে নারীর একটী ছোট মেয়ে তার কাছে বসে ছিল দেখ্‌লাম, কিন্তু তার পা বাঁধা নেই।

ওরা যে—

আজ বিকেলে আমরা হংকং পৌঁছলাম। অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় বেশ শীত পড়েছে। হংকং সমুদ্রের মাঝে একটা দ্বীপ। তাই জাহাজ সেখানে একেবারে গিয়ে লাগে না। হংকংএর অনতিদূরে কাইলুন নামে জায়গার জেটিতে আমাদের জাহাজ লাগ্‌ল। কাইলুন চীন দেশের একটা ছোট অংশ। হংকংএর দৃশ্য সিঙ্গাপুরের মত অতটা চমৎকার নয়। হংকং দ্বীপটা পাহাড়ে পরিপূর্ণ। প্রথমেই চীনে ধোবাকে কিছু কাপড় ধুতে দিলাম। জাহাজ আস্‌তেই তারা এসে ময়লা কাপড় নিয়ে যায়। সিঙ্গাপুরে ধোবার দর অত্যন্ত বেশী, বারো খানা কাপড় ধুতে দুই ডলার নিয়েছিল, উপায় না থাকায় কাপড় ধোয়াতে হ'ল। জাহাজ কাইলুনের জেটিতে পৌঁছতেই আমাদের সহযাত্রীদল অনেকেই নেমে হংকং দেখ্‌তে গেলেন। অন্ধকার হতে দেরি আছে দেখে আমরাও হংকংটা একবার দেখ্‌বার জন্যে নেবে গেলাম। জেটি পেরিয়ে হংকং যাবার খেয়া-ঘাটে যেতে হয়। সেখানে তিন আনার টিকিট কিনে একটা ছোট লঞ্চে বসা গেল। জাহাজটা ঘাটে লাগান ছিল। দশ মিনিট অন্তর একটা খেয়ার জাহাজ পাওয়া যায়। পাঁচ সাত মিনিটে হংকং দ্বীপে পৌঁছন গেল। হংকংএ পৌঁছে আমরা দুটো রিক্‌সা ভাড়া নিলাম। জায়গাটা পাহাড়ে। নীচে সমতল জায়গায় দোকান ও সুন্দর রাস্তা আছে। পাহাড়ের গায়ে লোকের বাড়ি ঘর। একেবারে উপর পর্য্যন্ত ঘর বাড়ি আছে। বাড়িগুলিতে রাত্রে আলো জ্বল্‌লে দূর থেকে হংকংটাকে বড় সুন্দর দেখায়। পাহাড়টা তারায় খচিত আকাশের মতো মনে হয়। এত দোকান একত্রে খুব কম দেখেছি। দোকানগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমতল জায়গাটাতেই শুধু মোটর চলে। সেজন্যে মোটর বেশী নেই। রিক্‌সা আছে ও ডাণ্ডির মত এক রকম যানও আছে; তাকে "সিডেন চেয়ার" বলে।

এই ছুটী যানই এদেশে ব্যবহার হয় বেশী। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল সে জন্যে আমরা ২।১টী দোকান দেখে আবার খেয়া-ঘাটে এলাম। তারপরে জাহাজে এসে পৌছলাম।



হংকংএর রাস্তা

৪ঠা মে—

সকালে খুব বৃষ্টি পড়্ছে—সেজন্যে আমার স্বামী শুধু একবার কিছু দরকারী জিনিস কিন্‌তে গেলেন। বিকেলে আমিও স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে দোকানগুলো একটু দেখ্‌লাম। সময় ছিল না, সে জন্যে আর কোথায়ও যাওয়া গেল না।

৫ই মে—

সকালে চীনে ধোবা কাপড় এনে দরজায় ধাক্কা দিয়ে "Close wash, 7 O' clock go" বলে চিৎকার করতে লাগ্‌লো। চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কাপড় কিন্তু ভাল হোয়নি। নির্দ্দিষ্ট দামের চেয়ে সে দাম

সেন্ট কম্ নিলে। আমাদের দেশের ধোপারা কিন্তু তা কখনই করতো না। আজও খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ব্রেকফাষ্ট্ খাবার আগেই জাহাজ ছেড়ে দিলে। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগ্‌লো।

সাংহাই

৮ই মে—

আমরা ইয়াংসিকিয়াং নদীতে এসে পড়েছি। নদীটা খুব বড় কিন্তু জল অত্যন্ত ঘোলা। নদীর দু'ধারের দৃশ্য অনেকটা আমাদের বাংলা দেশের



ইয়ংসিকিয়াং নদীতে চীনে জেলেদের নৌকা

মত—খুব শস্য শ্যামল। মাটি একেবারে সমতল, পাহাড়ের চিহ্ন মাত্র নেই। এখানেই প্রথম গরম কাপড় বাক্স থেকে বের করে আনতে হলো। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। বিকেলে সাংহাইয়ের বন্দরে এসে পৌছলাম। সাংহাইটা খুব বড় সহর। সহর দেখবার জন্যে জাহাজ বন্দরে পৌছবার আগেই প্রস্তুত হয়ে রইলাম। কিন্তু জায়গাটা মোটেই সুন্দর নয়। অনেক ঘর বাড়ি দেখা গেল কিন্তু প্রায় সব লাল টিনের ছাত। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এখানে খুব কম।

জাহাজ বন্দরে থাম্‌তেই আমরা নেবে গেলাম। জেটি থেকে রাস্তা খুব নিকটে। আমরা এখানে ট্রামে চড়ে জায়গাটা ঘুরে দেখা স্থির কর্‌লাম। জেটি থেকে রাস্তায় বেরুলেই ট্রাম। রাস্তার অন্য পারে একটা বোর্ডিং হাউসের নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার সামনে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সাহেবী পোষাক পোরে দাঁড়িয়েছিল—তার কাছে গিয়ে আমার স্বামী তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, ট্রামের সাহায্যে সমস্ত সহরটা কি ঘুরে দেখা সম্ভব? সে বল্লে, একটা গাড়ী করে দেখ্‌লে আরও ভাল করে দেখা যাবে। লোকটী খুব ভদ্রতা সহকারে আমাদের জন্যে একখানি গাড়ী আন্‌তে গেল। কিন্তু সেদিন ঘোড়দৌড় ছিল সে জন্যে গাড়ি পাওয়া গেল না। অবশেষে আমাদের ট্রামের সাহায্যই নিতে হলো। ট্রামের রাস্তার দুধারে অনেক দোকান; কিন্তু ট্রামগুলোতে কেবল চীনে লোকেই ভরা। ইংরেজ, এমেরিকান ও এঙ্গ্‌লো-চীনদেরও দু চার জনকে দেখা যাচ্ছিল। একটা সুন্দর বাগান আমাদের বাঁ ধারে দেখা গেল। সেখানে নানা রকমের ও নানা জাতির লোকের সমাগম। তারা সমুদ্র-বায়ু সেবনের জন্যে এই জায়গায় এসেছে। কতগুলি পারশী মহিলাকেও দেখা গেল। আমরা কতকদূর গিয়ে অন্য একটা ট্রাম নিলাম; সেখান থেকে দুটো বড় বড় পূলের উপর দিয়ে ট্রামে করে শেষে বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ছোট রাস্তায় এসে পোড়লাম। পুল দুটী যে নদীর উপর সে নদীতে শত শত বড় নৌকা যাওয়া আসা করছিল। এবার যে রাস্তায় এলাম এটা খাদ্য দ্রব্যের জিনিষে ভরা—মাংস মাখন ইত্যাদি সব রকমের হাট বসে গেছে। কিন্তু সবই চীনে দোকান, চারিদিকেই চীনে। সিঙ্গাপুরে প্রথমে হঠাৎ এত চীনে লোক দেখে বেশ মজা লেগেছিল। কিন্তু চীনে দেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই আর নতুন বোধ হচ্ছে না। এ রাস্তাটায় খানিক দূর যাবার পর আমরা নেবে

পড়লাম কারণ এখানে "Bubbling Well" বলে একটা দর্শনীয় জায়গা আছে। এই খবরটা আমরা জাহাজেই পেয়েছিলাম। আমরা



চীন দেশের চাষ-প্রণালী

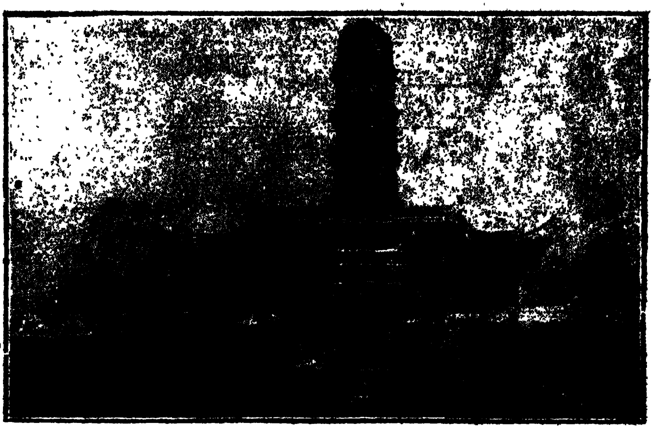


সাংহাই

এখন সেই জায়গার খোঁজে বেরুলাম। এত বড় সহরে ভাষা না জেনে একটা অচেনা জায়গার খোঁজে যাওয়া যে কি দুঃসাহস তা বলাই বাহুল্য। যা হোক্ আমরা ত Bubbling Wellএ যাবার ট্রামে চড়্‌লাম। এই জায়গার একটা পাতকুয়ো থেকে দু-তিন মিনিট অন্তর বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে ইহাই নাকি দর্শনীয় ব্যাপার। একথা শুনে আশ্চর্য্য বলে মনে হয় নি। আমাদের সময় ছিল সে জন্যে একটু বেড়িয়ে আসাই উদ্দেশ্য। ট্রামে বসে এখানকার চীনে লোকেদের দেখ্‌তে দেখ্‌তে চল্‌লাম। এখানকার মেয়ে পুরুষ সকলেই একটু বিলিতি ধরণ-ধারণ অভ্যাস করেছে। কতক চীনে মেয়ে আবার তাদের নিজেদের পোষাকের সঙ্গে বিলিতি ধরণের উঁচু "হিল" জুতো পরেছে। সচরাচর চীনে মেয়েরা তাদের চুলের খোঁপাটা খুব টেনে বাঁধে। কিন্তু এখানে অনেকে বিলিতি ধরণের "ফ্রিঞ্জ" করে চুল রেখেছে। দেখ্‌তে মোটেই খাপ খায় না। চীনে মেয়েরা প্রায়ই প্যাণ্টলুন ও একটা আল্‌গা হাতওয়ালা জামা পরে। এখানে অনেকে পেণ্টলুনের জায়গায় "স্কার্ট" (ঘাঘ্‌রা) পরেছে। কিন্তু জামাটা ওদের নিজেদের মত রেখেছে। "Bubbling Well"এ যেতে রাস্তায় ঘোড়-দৌড় মাঠ দেখা গেল—সেখানে অনেক চীনে ও বিলিতি লোকের মস্ত সমাগম লক্ষ্য করলাম। এখন আমরা যে রাস্তায় তার দুই ধারেই সাহেবী ধরণের বাড়ী। এখানকার ইয়োরোপীয়দের বাসস্থান। এর কাছেই "Bubbling Well"; কিন্তু এখানে পৌঁছতে এত সময় লাগ্‌ল যে প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। এ অবস্থায় আর Bubbling Well দেখ্‌তে যাওয়া আর না যাওয়া সমান। তা ছাড়া এখানেই ট্রামের শেষ। এখন সেখানে যেতে যে কত সময় লাগ্‌বে আর কি উপায়ে যাওয়া সম্ভব হবে, তার অনিশ্চিত; সে জন্যে ফিরবার দিকের একটা ট্রামে উঠা গেল। আবার সেই সুখ রাস্তা হয়ে দোকানের রাস্তায় এলাম. তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।



সাংহাইর রাস্তা



সাংহাইয়ে চীনে মন্দির

ট্রামের লোক ইংরাজি ভাষা বলে না, সেজন্যে কোন্ ট্রামে যে কোথায় যাওয়া যায়, তা জানা বড় শক্ত। শেষে একজন ইংরেজের শরণাপন্ন হতে হলো। সে জাহাজ-ঘাটের যাবার ট্রাম দেখিয়ে দিলে আমরা তাতেই উঠ্‌লাম—কিন্তু ঠিক কোথায় নাব্‌তে হবে তা অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল না। ট্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করেও কোন সাহায্য পাওয়া গেল না, তারা ইংরাজী বোঝে না। ট্রামটা যখন তার শেষ সীমানায় এলো, তখন বুঝ্‌লাম যে জেটির কাছে যাবার জন্যে আমাদের যেখানে নাবা উচিত ছিল সেখানে নাবি নি। যাহোক্ এখানেই নেবে পড়া গেল কিন্তু অন্ধকারে রাস্তা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না—একটা চীনে পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল—তাকে উনি জেটি কোন দিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কিছু বোঝাতে পারলে না। বড় বিপদে পড়া গেল। জাহাজের ডিনার ঠিক সাড়ে সাতটায় হয়—তখনি প্রায় সাড়ে সাতটা। অন্য উপায় না থাকায় আমরা আরও একটু এগিয়ে গেলাম—ভাগ্যক্রমে একজন পাঞ্জাবি পুলিশকে দেখা গেল; তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে আমাদের পথ দেখিয়ে দিল। অবশেষে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় আমরা জেটিতে এসে পৌঁছলাম।

সিঙ্গাপুর হংকং ও বিশেষ ভাবে সাংহাইয়েতে অনেক শিখ ও পাঠান পাহারাওয়ালা আছে। এরা প্রত্যেকেই খুব লম্বা ও বলিষ্ঠকায় পুরুষ। খর্ব্বাকৃতি চীনেদের মধ্যে এদের আরও লম্বা ও বলবান্ দেখায়। এদের দেখ্‌লে আনন্দ হয় কি দুঃখ হয়, তা বলা শক্ত। এই বলবান্ দীর্ঘকায় পাহারাওয়ালা যে আমাদের দেশের লোক এ কথা মনে হলে গর্ব্ব হয়, কিন্তু পরক্ষণে যখন মনে পড়ে যে এত বল এত সতেজ শরীর নিয়েও এরা সামান্য বেতনে দাসত্ব করছে, তখন লজ্জায় মরে যেতে হয়। আমরা ভারতমাতার কত অযোগ্য সন্তান দেশের বাইরে এসে যেন তা আরও বেশী রকমে উপলব্ধি করা যায়। মায়ের এমনি তেজীয়ান সন্তানগুলোও আজ

বিদেশে এসে দাসত্ব কর্‌ছে! ভারতের লোক দাসত্ব ছাড়া বুঝি আর কিছু জানে না!



চীনে প্যাগোডা (সাংহাই)

আমরা যখন জাহাজে পৌঁছলাম তখন সকলে খেতে বসে গেছে কিন্তু আমরা খাওয়া থেকে বঞ্চিত হইনি। আগে শোনা গিয়েছিল যে জাহাজ সকালেই সাংহাই ছাড়বে। সে জন্য আমরা এত তাড়াতাড়ি যারগাটা দেখে নিলাম। পরিশেষে নোটিশ বোর্ডে দেখ্‌লাম ১১ই বিকেলে আমাদের জাহাজ সাংহাই ছাড়বে। এখানে তিন দিন জাহাজ থাকবে।

৯ই মে—

আজ রবিবার। কতক যাত্রী নেবে গির্জ্জায় গেল—আমরা বিকেলে ড্রেসলার নামক একটা এমেরিকেন দম্পতির সঙ্গে বেরুলাম। আমরা মনে করেছিলাম গাড়ি করে সহরের চীনে-পাড়াটা দেখে আস্‌ব, কিন্তু গাড়ির কোচোয়ান্‌টা বল্‌লে চীনে-পাড়া যেতে হলে গাড়ির লাইসেন্স্‌ চাই। তার গাড়ির চীনে টাউনে যাবার জন্যে লাইসেন্স্‌ নেই। পুলিসকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে বল্লে অন্য গাড়ি বা রিকসা নিতে হবে। কিন্তু অন্ধকার হয়ে আস্‌ছিল সে জন্যে চীনে টাউনে না যাওয়াই স্থির করা গেল। দোকানগুলোতে আরও একটু ঘুরে জাহাজে ফির্‌লাম। চীনেদের অনেক খাবার দোকান দেখ্‌লাম। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের খাবার জিনিস গুলো যে কি তা লক্ষ্য করা গেল। একটা বড় "ট্রে" বা থালার উপর সাত আটটা চীনের মাটির বাটি রাখা আছে; প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা রকমের তরকারি রয়েছে। তরকারিগুলি চোখে দেখ্‌তে বেশ উপাদেয় বলে মনে হলো। আমাদের দেশের মাছ ও সব্‌জির তরকারির মত দেখ্‌তে। তবে খেতে কেমন সেটা চেষ্টা করে দেখ্‌তে সাহস হলো না। একজন চীনে বাটীতে তরকারি সজ্জিত "ট্রে" সামনে নিয়ে বসেছিল। একটু পরেই দোকানদার একটা হাঁড়িতে করে ভাত আন্‌লে এবং একটা কাঠের চামচের দ্বারা তরকারির বাটির মধ্যে ভাত দিলে। যে লোকটা খেতে এসেছিল সে ভাত ও তরকারি "চপ্‌ ষ্টিক্‌" দিয়ে মিশিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিল। আবার জাহাজে ফিরে এলাম।

১০ই মে—

আজ সকালে চীনে টাউন দেখ্‌তে যাব বলে আমরা কুক্‌*কোম্পানীর

কাছে টিকেট কিন্‌লাম। গাড়ি ও পথ প্রদর্শকের (গাইড্) জন্য প্রত্যেকের তিন ডলার লাগ্‌বে। মিঃ ড্রেস্‌লারও আমাদের সঙ্গে যাবেন। তিনিও একখানা টিকেট কিন্‌লেন। টিকেট কিনে মিঃ ড্রেস্‌লার চলে গেলেন। আমরা সাংহাইয়ের বাগানটা দেখতে বার হলাম। পথের মাঝে একটা পার্‌শী দোকানে যেতেই তারা খুব আদর অভ্যর্থনা করলেন। পার্‌শী দোকানদার ও তাঁর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে অনেক আলাপ কর্‌লেন। শুন্‌লাম এখানে প্রায় সত্তর ঘর পার্‌শী পরিবার আছে এবং তাদের ক্লাবও আছে।

বিকেলে আর বেরুলাম না, ভয়ানক বাদলা ছিল। চীনে টাউন কিন্তু আর দেখা সম্ভব হলো না, অত্যন্ত বৃষ্টি বাদল ছিল—আমার স্বামী কুকের কাছে গিয়ে টিকিট ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে এলেন। তিনটার সময় জাহাজ ছাড়্‌ল।

১১ই মে—

আমাদের জাহাজ এখন ইয়াংসিকিয়াং নদী ছেড়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে। সাংহাই ও হংকংএ অনেক যাত্রী নেবে গেছে। আর জায়গার অভাব নেই। আহারের সময় কাপ্তানের টেবিলে আমাদের বস্‌বার জায়গা হোলো।

১৩ই মে—

আজ সকালে আমরা প্রায় জাপানের কাছে এসে পৌচেছি! খুব ঠাণ্ডা, মেঘ করে আছে, দু ধারে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বেলা চারিটার পর জাহাজের সম্মুখে ডেক্ থেকে প্রথম জাপানের দৃশ্য দেখা গেল। কিছু দূরে একটা জাপানী গ্রাম পাহাড়ের উপরে লক্ষিত হল। গ্রামটার নাম "সিমানোসাকী"। সেখানে অনেকগুলো নৌকা ও কতকগুলি জাহাজও

ছিল। আমাদের জাহাজ এখানে পাইলট্ নেওয়ার জন্যে দাঁড়াবে। জাহাজের মাস্তুলে আজ অনেকগুলি নিশান উড়ছে। তার মধ্যে একটা জাপানী নিশানও আছে। অন্য চারটা নিশান দিয়ে "টাকাডা" জাহাজের নাম সঙ্কেতে জানানো হচ্ছে। নৌ ভাষায় এই চারটী নিশান দেখলেই বন্দরের ও অন্য জাহাজের লোক বুঝে নেবে যে এ জাহাজটীর নাম "টাকাডা"। অল্প পরেই পাইলটের মোটর বোট্ দেখা গেল; জাহাজও অমনি দাঁড়াল। পাইলট্ কথা বল্‌বার যন্ত্র দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "ফুজি না কোবে" অর্থাৎ কোন্ বন্দরের জন্য যাত্রী। আমাদের কাপ্তান তার উত্তরে বল্লে, "কোবে"। পাইলট্ এসে তখন আমাদের জাহাজে উঠ্‌ল এবং সোজা কাপ্তানের "ব্রিজ্ ডেকে" গেল। এখন আমরা জাপানি রাজ্যে, সে জন্যে পাইলট্‌ও অবশ্যিই জাপানি, লোকটার পোষাক পরিচ্ছদও অবিকল জাপানী। পরনে একটা মোটা ওভার-কোট্—পায়ে চটিজুতা ছিল। কাপ্তেনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দু-চার কথা বল্লে। কিন্তু কাপ্তেন তেমনি অমায়িক ভাবে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্লে না। জাহাজ আবার চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। ইংরেজদের মনের ভাব আজ বড় ম্লান বলে বোধ হলো। জাপানীদের স্বাধীনতা এঁদের কাছে ভাল লাগেনা তা বেশ বুঝ্‌লাম। এরাও যে একটা বড় স্বাধীন জাত বোধ হয় এইটাই তাঁদের আঘাত করে। ভারতবর্ষে এঁদের সর্ব্বত্রই আধিপত্য, কিন্তু এখানে এঁরা কেউ নয়। এখন থেকেই তাঁদের ভাব-ভঙ্গি বদ্‌লে গেছে। সেই উগ্র ভাব অনেক নম্র হয়ে এসেছে। এতদিন তাঁরা জাপানি যাত্রীদের সঙ্গে ভাল করে কথাও বল্‌তেন না; কিন্তু আজ যে কয়জন জাপানি যাত্রী প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন, তাঁদের উপর খুব নজর পড়ে গেছে।

ডিনারে আজ শেষ ডিনার বলে champagne ও অন্য সুরা বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছিল। মেজার মরিসন্ বলে একজন যাত্রী কাপ্তানকে

ধন্যবাদ দিলেন ও আমাদের যাত্রা খুব আরাম-জনক হয়েছে ইত্যাদি একটী ছোট বক্তৃতা দিলেন। কাপ্তান তার উত্তর দিলেন। ডিনারের পর কাপ্তান কয়েক জন ইংরেজ ও আমাদিগকে তাঁর ক্যাবিনে ডেকে গ্রামোফোন্ শোনালেন; তারপর সকলকে (অবশ্যি আমরা খাইনি) মদ ইত্যাদি খাওয়ালেন।

জাপান রাজ্যে

১৪ই মে —

আমরা সকালে জাপানের বিখ্যাত ভূমধ্য সাগরে (Inland Sea) ঢুকলাম। এই সমুদ্রের দৃশ্য অতি চমৎকার। যাঁহারা এ অঞ্চলে বেড়াতে আসেন, তাঁহারা শতমুখে ইহার প্রশংসা করেন। অনেকেই ভোর ৫টায় উঠে দৃশ্য দেখ্‌তে ডেকের উপর গিয়েছিলেন। আমার ঘুম ভাঙ্গেনি; কিন্তু আমার স্বামী উঠে সে দৃশ্য কিছুক্ষণের জন্যে দেখেছিলেন; তিনি বল্লেন ইহা অতি সুন্দর। বেলা হলে আমরা যা দেখলাম, সে দৃশ্যও চমৎকার; কিন্তু আগের তুলনায় কিছুই নয়। এতেই বুঝলাম, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য হতে বঞ্চিত হয়েছি। আগে সমুদ্র সংকীর্ণ ছিল, এখন অল্পে অল্পে আবার চওড়া হতে লাগল। দশটার সময় দূরে ডাঙ্গা দেখা গেল। শীঘ্র জাহাজ ছাড়্‌তে হবে বলে সমস্ত জিনিষ পত্র বন্ধ কর্‌লাম। সাড়ে তিনটায় জাহাজ কোবেতে পৌঁছল। কিন্তু জেটিতে গেল না, কারণ জেটিতে এত জাহাজ আছে যে, সেখানে আর জায়গা নেই। কোবেতে জাহাজ দাঁড়াতেই একজন জাপানি অফিসার পাস্‌পোর্ট দেখ্‌বার জন্য এলেন। ডাক্তারও জাপানি; এখানে সবই জাপানি। কুক্ কোম্পানির চিঠি পেয়ে জানা গেল যে আমাদের জন্যে হোটেলে জায়গা ঠিক কর্‌তে পারেনি। হোটেলে নাকি সবই ভর্ত্তি। তবে ওরিএণ্টেল্ অথবা থর্ হোটেল চেষ্টা করতে লিখেছে। অন্য যাত্রীরাও হোটেলে জায়গা নেই খবর পেল। তখনই কাপ্তান একটা নোটিস দিলেন যে হোটেলে জায়গার অভাবের জন্য আজ রাতটা যাত্রীরা জাহাজে থাক্‌তে পারবে। বাঁচা গেল। বি, আই, এস্, এন্ কোম্পানীর কয়েকটি "লঞ্চ" (ছোট

জাহাজ) যাত্রীদের ডাঙ্গায় নেবার জন্য এসেছিল, তাইতে আমার স্বামী এবং অন্য যাঁরা হোটেলে জায়গা পান্‌নি, তাঁরা সকলেই হোটেলের সন্ধানে বেরুলেন। সাতটার সময় লঞ্চ্ ফিরে এলো, যাত্রীরাও প্রায় সকলেই ফিরে এলেন। আমার স্বামী ওরিয়েণ্টেল্ হোটেলে ঘর দেখে এসেছিলেন বল্লেন, খুব সম্ভব কাল ঘর পাওয়া যাবে।

১৫ই মে—

সকালে উঠে আমরা জাহাজ ত্যাগের বন্দোবস্ত কর্‌লাম। জিনিষ-পত্র সমস্ত বন্ধ করে জাহাজে রেখে আমরা হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ্ খাব এবং হোটেলে ঘর ঠিক হলে জিনিষপত্র সেখানে নিয়ে যাব এই ব্যবস্থা হোল। কিন্তু ডাঙ্গায় যাবার লঞ্চ্ নেই। সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত জাহাজ কোম্পানির লঞ্চের অপেক্ষায় বসে রইলাম। তারপর যখন সে লঞ্চ্ এলো না, তখন একটা মোটর বোট্ করে পার হতে যাচ্ছি, এমন সময় ওরিয়েণ্টেল হোটেলের লোক তাদের নিজেদের লঞ্চ্ নিয়ে আমাদের ও আমাদের আসবাব পত্র নিতে এলো। আবার জাহাজে গিয়ে সমস্ত জিনিষ-পত্র আন্‌লাম এবং ডাক্তার কাপ্তান্ ষ্টুয়ার্ডেস্ ইত্যাদি সকলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে জাহাজ ত্যাগ কর্‌লাম। আমাদের হোটেলের লঞ্চ্ কোবের ঘাটে এসে পৌছ্‌ল। ঘাটে নেবেই একটু দূরে Custom House (শুল্ক ঘর)। সেখানে আমাদের বাক্সগুলো হোটেলের লোকেরা আন্‌ল। আমাদের কাছে কল্‌কাতার জাপানি কন্সাল্ মিঃ সাকানোবির সুপারিস চিঠি ছিল। আমার স্বামী সে চিঠিখানা শুল্ক ঘরের যে জাপানি কর্ম্মচারী ছিল তাকে দেখালেন। চিঠিতে মিঃ সাকানোবি আমাদের পরিচয় দিয়ে বলে-ছিলেন আমাদের বাক্স পত্র যেন খোলা না হয়। চিঠি আমার স্বামীকে নিজে মিঃ সাকানোবি দিয়েছিলেন। চিঠিতে বাস্তবিক কাজ হলো। শুল্ক-ঘরের অফিসার চিঠি পড়ে ওঁর সঙ্গে বেশ অমায়িক ব্যবহার কর্‌লেন।

কর্ত্তব্যের নির্ব্বন্ধের জন্য মাত্র একটি বাক্স খুলে দেখ্‌লেন ও আমাদের সঙ্গে বেশী সিগারেট আছে কিনা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। আমাদের কাছে একটা টিন ছিল সেটায় একটা ছাপ মেরে ওঁর নাম লিখে দিলেন। শুল্ক আফিসের কর্ম্মচারীরা আমাদের জাহাজের একটি দম্পতির বাক্স ইত্যাদি সব খুলে দেখ্‌লে। আমাদের কাছে মিঃ সাকানোবির চিঠি থাকায় আমরা যে কি ঝঞ্ঝাট থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছি তা এই ইংরেজ দম্পতিদের উপর শুল্ক ঘরের লোকেদের ব্যবহার দেখে বেশ উপলব্ধি করা গেল! সে বেচারারা সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের সব বাক্স খুলে দেখাতে লাগ্‌ল, আর আমরা নিশ্চিন্ত মনে হোটেলে এলাম। হোটেলের লোক আমাদের জিনিষ পত্রের ভার নিলে। খবর পেলাম দশ নম্বরের ঘর আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে। একজন জাপানি চাকর লিফ্‌ট্ (lift) করে আমাদের ঘরে নিয়ে পৌঁছে দিল। ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হোটেলটা জাপানিদেরই, কিন্তু সব বিলাতি ধরণে সাজানো। থাওয়া দাওয়াও বিলাতি ধরণের। এখানে বেশী এমেরিকান ও বিলাতি লোক থাকে; জাপানির সংখ্যা কম। তবে চাকর-বাকর, কেরাণী ইত্যাদি সব জাপানি। একজন শ্বেতকায় ম্যানেজার আছেন—তিনি এমেরিকান্। আমাদের ঘরটি আমাদের বেশ পছন্দ হ্‌লো। সেথানে জিনিষপত্র রেখে আমরা টাকা বদ্‌লাবার জন্যে বেরুলাম; সঙ্গে আমাদের জাপানি টাকা ছিল না। অল্প দূরে যেতেই একজন জাপানি ভদ্রলোককে দেখে উনি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, ব্যাঙ্কে যাবার রাস্তা কোন্ দিকে। জাপানি লোকটির বিলাতি কাপড় পরা ছিল। ইংরাজি ভাষায় ওঁকে বল্লে—"চলুন্, আমি ব্যাঙ্ক্ দেখিয়ে দিচ্ছি"। রাস্তায় যেতে যেতে ওঁর সঙ্গে অনেক আলাপ হ্‌ল এবং পরে আমাদের যদি তার সাহায্যের কোন দরকার হয় ত সে খুব আহ্লাদের সহিত সাহায্য করবে একথাও জানালে। আমাদের কিন্তু

নূতন দেশে একটা রাস্তার অপরিচিত লোককে এতটা বিশ্বাস করতে সাহস হলো না ; শেষে "অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ" হয়ে না দাঁড়ায়! এই সব ভেবে ব্যাঙ্কে এসে অল্পক্ষণ পরেই তার সাহায্যের জন্যে প্রচুর পরিমানে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিলাম ; ব্যাঙ্কের কাজে আমাদের আধ ঘণ্টা সময় লাগল। দেখা গেল, আমাদের টাকা এদেশে বদলাতে অনেক লোকসান যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, টাকা বদ্‌লে হোটেলে ফিরে এলাম। তখন লাঞ্চের সময়। এখানকার খাবারের তালিকা একটা বিরাট ব্যাপার। কত রকমের খাবার "মেনুতে" (তালিকাতে) যে দিয়েছে তা বলা যায় না। কতক বিলিতি আবার কতক এমেরিকান্, অল্প কিন্তু জাপানিও আছে। জাপানি খাবার কিন্তু আমরা খাই নাই, তাতে কাঁচা মাছ আছে বলে বোধ হলো। হোটেলে যারা থাকে তারা ছাড়াও অনেক বাইরের লোক এখানে শুধু খাবার জন্য আসে। প্রকাণ্ড বড় খাবার ঘর, তবু সেখানে সব লোকের জায়গা হয় না। সে জন্য পাশে আর একটা ঘরেও লোকদের খাবার দেওয়া হয়। লাঞ্চে যাবার আগে হাত মুখ ধুতে ঘরে গিয়ে দেখি আমাদের বাক্সপত্র সব এনে গুছিয়ে রেখে গেছে। বিকালে আর বেরুলাম না। হোটেলটা মস্ত বড়। আমাদের ঘরটি দ্বিতলে। নীচের তলায় ঢুকেই মস্ত বড় "লাউঞ্জ্"—সেখানে বসে বিশ্রাম কর্‌বার ও কাগজ পড়্‌বার খুব সুবিধা। পাশেই হোটেলের অফিস; দুপাশে উপরে যাবার জন্যে প্রকাণ্ড দুটা সিঁড়ি। নীচের তলাতেই খাবার ঘর ও বিলিয়ার্ড ঘর। আজ শনিবার সে জন্য নাচ হবে। প্রত্যেক শনিবারে চা খাবার সময়ে ব্যাণ্ড্ বাজে।

মেয়েদের কন্‌সার্ট্‌

১৬ই মে—

সকালে আমরা নীচে লাউঞ্জে বসে আছি এমন সময় দেখ্‌লাম অনেক জাপানি মেয়ে হোটেলে আস্‌ছে। আমরা প্রথমে মনে করলাম ওরা হোটেলে থাক্‌তে আস্‌ছে। ওদের অনেকের হাতে ছোট বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি ছিল। লাঞ্চ্‌ খেতে গিয়ে উনি জাপানি ষ্টুয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েদের এত জনতার কারণ কি? সে বল্লে, খাবার ঘরের উপরের "বল্‌ রুম" (নাচঘর) আছে, সেখানে আজ একটি জাপানি বাজনার কন্‌সার্ট হবে। আমার স্বামী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কারা কন্‌সার্ট করবে? সে বল্লে, সব বড় ঘরের জাপানি ভদ্রমহিলারা এসেছেন, তাঁরাই কন্‌সার্ট করবেন। আমরা সেখানে গিয়ে দেখ্‌তে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করায় ষ্টুয়ার্ড্‌ বল্লে "হাঁ নিশ্চয়; ওঁরা আহ্লাদের সহিত আপনাদের দেখাবেন"। লাঞ্চ্‌ শেষ করে আমরা লিফ্‌ট করে তেতলায় "বল রুমে" গেলাম। ঘরটী প্রকাণ্ড বড় একটী মাত্র "হল্‌"। ভিতরে প্রায় তিন চার শত জাপানি পুরুষ ও মহিলা ছিল; তন্মধ্যে মহিলার ভাগই কিন্তু বেশী। ঘরের দরজার কাছে একজন পুরুষ মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার স্বামী তাঁকে বল্লেন, আমরা ভারতবাসী এদেশে বেড়াতে এসেছি, আমরা এই কন্‌সার্ট দেখতে ইচ্ছুক, দেখ্‌তে পারি কি? লোকটি অতি ভদ্রতার সহিত আমাদের ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে এক পাশে আমাদের জন্য তিনটী আলাদা চৌকি দিলেন এবং বস্‌তে বল্লেন। ঘরে ঢুকেই ঘরের ডান দিকের শেষ ভাগে একটী বেদী ছিল। সেটী লাল মখমলের

ড্রপ্‌-সিন্‌ দ্বারা আবৃত, তার সম্মুখে বেদীর নীচে দুই ধারে দুটী "চেরি" ফুলের গাছ। অনেকেই হয় ত জানেন চেরি ফুলের গাছের জন্য জাপান বিখ্যাত। এই দুটী সেই চেরি ফুলেরই কৃত্রিম গাছ। এত বড় গাছ ঘরের মধ্যে জন্মান সহজ ব্যাপার নয়। গাছগুলি দশ বার ফিট উঁচু। তাতে ফুল ফুটে আছে, এমন নকল করেছে যে দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন আসল চেরিফুল গাছে ফুটে আছে। ফুলগুলি গোলাপী রঙের। কতকটা আমাদের দেশের সোনাল ফুলের মত। গাছে একটাও পাতা নেই, শুধু ফুলেই ঢাকা। গাছের উপর ফুলের মধ্যে মধ্যে কাগজের জাপানী লণ্ঠন ঝোলান আছে। এদেশে চেরিফুল যখন সব গাছে ফুটে থাকে তখন না জানি কত সুন্দর দেখায়। এই দুটি গাছ তার অনুকরণ মাত্র। কিন্তু তবুও এতে কত সৌন্দর্য্য! বেদির সম্মুখে জাপানি মেয়েরা এক একটি ছোট গোল আকারের গদির উপরে তাদের অভ্যাস মত হাঁটু গেড়ে বসেছে। সামনে নীচে একশত দেড়শত মহিলা এক সঙ্গে মেঝের উপরে সেই রকমে বসেছে। তারপর যাওয়া আসার জন্যে একটু রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আবার প্রায় তিন শত লোক চেয়ারে বসেছে। এর মধ্যে মেয়ে পুরুষ দুই আছে, তবে মেয়ের সংখ্যাই বেশী। ঘরের পিছনের দুই কোণে দুটি নকল "পাইন্‌" গাছ। সামনে চেরিফুলের গাছ গুলি যত বড় পাইন্‌ গাছ গুলিও তত বড়। পাইন্‌ গাছগুলিকে বিজলির আলো দিয়ে সাজান হয়েছে। সমস্ত ঘরটি অতি পরিপাটী রকমে সজ্জিত। অল্পের মধ্যে এমন পরিপাটি করে সাজানো ঘর আমরা খুব কম দেখেছি। এখানে দেখ্‌লাম, আমাদের দেশের সঙ্গে এদের একটি বিষয় খুবই মিলে যায়। আমাদের দেশের ভদ্রমহিলারা কোথাও কিছু দেখ্‌তে গেলে যেমন ছেলেপিলে সঙ্গে নিয়ে যান—এদেশের মেয়েরাও তাদের ছেলেপিলে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। কিন্তু এক ঘরে এত গুলি ছেলেপিলে থাকা

সত্ত্বেও একটু গোলমাল শোনা গেল না। এদের ছেলেপিলেদের বিশেষত্ব যে আমাদের দেশের ছেলেপিলেদের মত তারা কান্নাকাটি বা গোলমাল করে না। এদের মেয়েরাও সব চুপ-চাপ বসে আছে, বা আস্তে আস্তে কথা বল্‌ছে। এরা এত সংযত যে, এত স্ত্রীলোক একত্রে বসে আছে অথচ জোরে হাস্‌তে বা জোরে কথা বল্‌তে কাউকে দেখ্‌লাম না। যাদের মায়েরা এ রকম সংযত, তারা যে সংযম শিক্ষা করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এরা খুবই কম কথা বলে; যতক্ষণ বাজনা হচ্ছিল তারা একাগ্র চিত্তে সেই বাজনা শুন্‌ছিল। আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলেও একত্রিত হলে হাসি ঠাট্টা কথাবার্ত্তায় এত গোলমাল বাধান যে, যে শিক্ষা লাভের জন্য গেছেন বা যা কিছু উপভোগ করবার জন্যে গেছেন তার উপর অনেক সময় দৃষ্টিই থাকে না। আর আমাদের শিশুরা অকারণে বা সামান্য কারণে কান্নার রোল তোলে। এই জন্যে আজ কালকার আধুনিক মাতারা পাশ্চাত্য মাতাদের অনুকরণে কোনও সম্মিলনীতে শিশুদের সঙ্গে নিয়ে যান না এবং সেই কারণেই অনেক মাতাকে আমোদপ্রমোদ ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আমরা যে দিন জাপানি-মাতাদের মত সংযত হয়ে সন্তানদের সংযম শিক্ষা দিতে পার্‌ব, সেই দিন আমাদের দেশও উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে।

যা হোক, এখন বেদির উপর কি হচ্ছিল তাই বলি। আগেই বলেছি বেদিটী রঙ্গিন কাপড়ে সজ্জিত ছিল। প্রথমে পর্‌দা উঠ্‌তেই চার-পাঁচটি ছোট মেয়ে ও একজন ওস্তাদ "কোতো" নামে এক রকম জাপানি তারের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগ্‌ল। বাদ্যযন্ত্রটি আকারে অনেকটা ইংরিজি "হার্পে"র মত কিন্তু যন্ত্রটি মাটিতে রেখে দুহাতে বাজাতে হয়। এক হাতে তার টিপে সুর বের করে ও অন্য হাত দিয়ে একটি হাতির দাঁতের "মিজ্‌রাফ" দ্বারা তারে আওয়াজ করে। "মিজ্‌রাফের" ব্যবহারটা

আমাদের সেতারের মত, কিন্তু যন্ত্রের আওয়াজ কতকটা পিয়োনোর মত। ওস্তাদ ভদ্রলোকটি অন্ধ ও বুড়ো। তারপর আরও অনেকবার "সিন্" পড়্লো ও উঠলো। দশ-বারো থেকে আরম্ভ করে, কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়েরা ওস্তাদের সঙ্গে বসে বেদির উপর বাজনা বাজালো। "কোতো" ছাড়া ওরা আরও একটা যন্ত্র বাজালে, তার নাম "সামিসেন্"। এই যন্ত্রটির আওয়াজ ও আকার অনেকটা আমাদের সেতারের মত তবে মাত্র তিনটি তার আছে। একটা বড় কাঠের 'মিজ্রাফ" দ্বারা যন্ত্রটি বাজানো হয়। জাপানি বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে বেশ মিষ্টতা আছে তবে তাদের গৎ ও গানগুলি এত এক-ঘেয়ে যে বেশীক্ষণ শুন্তে ভাল লাগে না। মোটের উপর জাপানি সঙ্গীত খুব উঁচু দরের নয় বলে আমার মনে হোল।

আমরা যখন বসে সঙ্গীত শুন্ছি, তখন দূরে একটি জাপানি ভদ্রলোককে দেখে আমার স্বামী বল্লেন, মুখ ও আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে লোকটি শিক্ষিত ও মার্জ্জিত। সেই জন্যে উনি তার কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। সচরাচর জাপানিদের চোক নাক ছোট হয়, কিন্তু এ ভদ্রলোকটির আকৃতি অনেকটা আমাদের ভারতীয় লোকের মত। তার বেশ প্রশস্ত কপাল তবে—মুখে চোখে জাপানি ধাঁজও আছে। উনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছেন কিনা। তিনি বল্লেন কয়েকবার গিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা জান্লাম একটি বাজনার স্কুলের বালিকাদের পিতামাতারা খরচ দিয়ে এ কন্সার্টটির আয়োজন করেছেন; উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, তাঁদের মেয়েদের সঙ্গীত-বিদ্যা সকলের কাছে পরিচিত হয়। তা'ছাড়া যে সব যুবক বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তারা যাতে মেয়েদের গুণপনা প্রত্যক্ষ দেখে পাত্রী নির্ব্বাচন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যটাও তলায় থাকে। এই রকম কন্সার্টে বিবাহের সহায়তা হয়।

জাপানি মহিলাদের প্রায় সকলেই কালো কিম্বা ছাই রঙ্গের কিমোনো পরেছিলেন। তাঁদের পিঠের নাচে যে একটি বালিসের মত জিনিষ থাকে, সেটি আমাদের কাছে একটি প্রহেলিকা বলে বোধ হোত। এখন জানা গেল, সেটি কিমোনো বেঁধে রাখবার এক রকম কোমর-বন্ধ। জাপানিতে ওরা এটিকে "ওবি" বলে। জাপানি ভদ্রমহিলাদের এই "ওবি"টিই রঙ্গিন ও সৌখীন রকমে সাজান থাকে। ইঁহাদের কিমোনো কখনই রঙ্‌চঙে দেখা যায় না। রঙ্‌চঙে হয়, নাচওয়ালী ও চাকরাণী প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের কিমোনো। সুতরাং কিমোনো দেখে ইতর ভদ্র অনেকটা জানা যায়। কিন্তু বারো তেরো বছরের মেয়েদের রঙ্গিন কিমোনো পর্‌তে বাধা নেই। বালিকারা যখন রঙ্গিন কিমোনো পরে বেড়ায়, তখন তাদের এক একটিকে যেন সুন্দর প্রজাপতি বলে মনে হয়। বেশ-ভূষা সম্বন্ধে এই রীতি আমার বড় ভাল লাগ্‌ল। আমরা এতগুলি ভদ্রমহিলা একত্র দেখ্‌লাম কিন্তু কালো বা ছাই রঙ্গের কিমোনো ছাড়া অন্য কোন উজ্জ্বল বর্ণের কিমোনো কারুর গায়ে দেখা গেল না। তা'ছাড়া এক জনকেও সোণা বা হীরার গহনাও পর্‌তে দেখ্‌লাম না। খালি ঐ "ওবি"টিতেই ওদের পোষাকের বাহার। ধনী ঘরের মেয়েদের এক একটা "ওবিতেই" পাঁচ ছয় শত টাকা খরচ হয়। সকলে অবশ্য অত দামী "ওবি" পর্‌তে পারে না। গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা সুন্দর জরির ও রেশমের কাজ করা "ওবি" পরেছেন দেখ্‌লাম। যিনি যত ধনী তিনি তত দামী "ওবি" পরেন। জাপানী মহিলাদের চুল বাঁধবার কায়দা দেখ্‌লেও আশ্চর্য্য হতে হয়। ওরা নানা রকমে চুল বাঁধে ও চুলে অনেক রকমের চিরুণী ও পুঁতির গহনা লাগায়। মেয়েরা বিবাহের পূর্ব্বে এক রকমের চুল বাঁধে; চির-কুমারীরা আর রকমে চুলের বাহার করে; বিবাহিতা মহিলারা আবার অন্য রীতিতে চুলের তোয়াজ

করেন। যাঁহারা ছেলের মা তাঁহাদের চুল বাঁধার রীতি স্বতন্ত্র। ইহার সঙ্গে বিধবা বা বৃদ্ধাদের চুল-বাঁধার ভঙ্গির একটুও মিল দেখা যায় না। এত ভিন্ন ভিন্ন রকমে চুল বাঁধা অন্য কোথায়ও দেখিনি। জাপানি



জাপানী মহিলার কেশ-বিন্যাস

মহিলারা নিঃসংকোচে মুখে সাদা রং ও গালে ঠোঁটে লাল রং লাগায়। এটা কিন্তু তাদের কাছে কিছু খারাপ বলে মনে হয় না। সকলের সামনেই আমরা এদের মুখে রং লাগাতে দেখতাম। এটা ওদের একটা রীতি। যুবতী মহিলা মাত্রেই মুখে রং লাগায়, কিন্তু বৃদ্ধারা তা করে না।

যে জাপানি ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো তার একটি নয় বৎসরের কন্যা এই কন্সার্টে যোগ দিয়েছিল। সে একটি বড় মেয়ের সঙ্গে ও ওস্তাদের সঙ্গে বেদির উপর বসে "কোতো" যন্ত্র বাজালে। ভদ্র-লোকটির নাম মিঃ কাঁগাওয়া। ইনি কোবেতে একজন বড় সওদাগর, বেশ ভাল ইংরাজি বলেন। সে জন্যে তাঁর কাছ থেকে জাপানি আদব কায়দা রীতি-নীতি অনেক জানা গেল। তাঁর স্ত্রীও এখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে উনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ইংরাজি ভাষা জানেন না। সে জন্যে তাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারলাম না। তাঁর স্বামীর সাহায্যে তাঁর সঙ্গে যা দুএকটা কথা বললাম মাত্র।

এতগুলি মহিলা ও ছোট বালিকা দেখলাম কিন্তু একটিও সুন্দরী বলে মনে হলো না। মিঃ কাঁগাওয়া বল্লেন, ওদের মহিলারা প্রায় সবাই শিক্ষিতা। অবশ্য আমাদের দেশের ধারণায় ইংরাজি না জানলে শিক্ষা হয় না, কিন্তু এঁদের সে ধারণা নেই। খালি জাপানি ভাষাতেই এঁরা বেশ শিক্ষিতা হতে পারেন। আগে মেয়েদের সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সে বিবাহ হত, কিন্তু আজ কাল শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অনেকেই বিবাহ করে না। সে জন্যে বাইস-তেইস বৎসরের আগে জাপানি মেয়েদের বিবাহ হয় না। জাপানি মেয়েরা প্রায়ই চিরকুমারী থাকে না।

আমরা যতক্ষণ কন্সার্টে ছিলাম সকলেই আমাদের খুব আদর যত্ন করলেন। আমার ছেলেটিকে একটি ছোট্টো মেয়ে এসে কতকগুলি কাগজের পাখা ও ফুল উপহার দিলে। এঁদের ভদ্রতায় মুগ্ধ হতে হয়। এতগুলি মহিলা এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বিদেশী লোক বা বিদেশী পোষাক দেখে কেউ বিদ্রূপ হাসি ঠাট্টা বা কানাকানি করলে না।

আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এই কু-অভ্যাসটি খুবই আছে। জাপানিদের মধ্যে আজ এমন অনেক গুণ দেখা গেল যেগুলি আমাদের শিক্ষা করা উচিত। তারা কৃত্রিমতা মোটেই জানে না। চলা-ফেরা কথাবার্ত্তাতে এমন একটা স্বাভাবিকতা আছে, যা আমাদের দেশের



মির কাঁগাওয়ার কন্যা কোতো বাজাইতেছেন

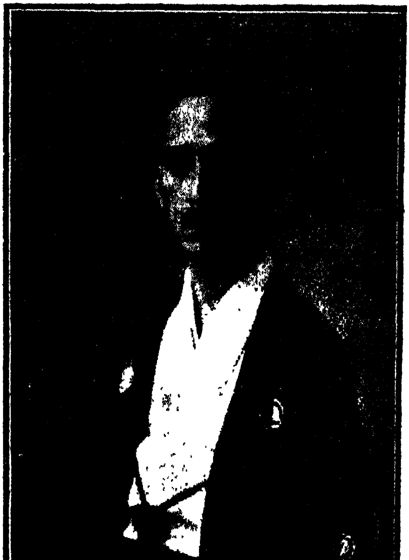
মেয়েদের মধ্যে [illegible]পই দেখা যায় না। অনর্থক লজ্জা বা জড়তা এদের মধ্যে একেবারে [illegible], [illegible] ব্যবহারে ওদের বেশ [illegible] সর্ব্বদাই বেশ প্রফুল্ল [illegible]ব বিরাজ করে। এদের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের তুলনা করলে আমাদের যে কত শিক্ষার অভাব তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমার মনে হয়, সংযমই হচ্ছে এদের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। তা থেকেই এদের অন্য সব গুণের উৎপত্তি হয়েছে।

আমরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা এই কন্‌সার্টে ছিলাম। শেষ হলে মিঃ কাঁগাওয়া আমাদের তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নীচের হলে চা খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। হোটেলে চারটার সময় থেকে ব্যাণ্ড বাজে ; সেই সময় অনেক বাইরের লোক হোটেলের লাউঞ্জে বসে চা পান করেন ও ব্যাণ্ড শোনেন।

এখানে চা খেলেই হোটেলবাসী এবং বাহিরের লোক সকলকেই দাম দিতে হয়। জাপানি চাকরানীরা গেইসাদের মত খুব রংচঙ্গে কাপড় পরে ও হেসে হেসে সকলকে চা দিয়ে আদর আপ্যায়িত করে। মিঃ ও মিসেস্ কাঁগাওয়া আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকটী জাপানি ভদ্র-মহিলাদের চা খেতে ডেকেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মোটে দুজন একটু ইংরিজি বল্‌তে পারেন। মিঃ কাঁগাওয়াকে আমাদের ও তাঁদের ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যস্থ হয়ে কথাবার্তা বল্‌তে হচ্ছিল। চা খাবার পরে আবার কন্‌সার্ট হবে সে জন্য মিসেস্ কাঁগাওয়া ও অন্য মহিলা কয়জন কন্‌সার্ট শুন্‌তে আবার উপরে গেলেন। মিঃ কাঁগাওয়া তাঁদের মোটর করে আমাদের একটী বাগান দেখতে নিয়ে গেলেন। বাগানটীর নাম "সুর্ত্তমা বাগান"। আমরা বাজারের মধ্যে দিয়ে অনেক ভদ্রলোকের বাস গৃহের পাশ দিয়ে মোটর করে "সুর্ত্তমা বাগানে" এলাম। কোবে সহরের এখন একটা ভাল পরিচয় পাওয়া গেল। সহরটা বেশ বড়, অনেক বড় বড় পাকা বাড়ী আছে ; সেগুলি আফিস দোকান ইত্যাদি। এটা একটা জাপানি বন্দর ; সে জন্যে অনেক ইংরেজ ও এমেরিকেনও দেখাও যায়। সুর্ত্তমা বাগানটা একটা পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ের নীচে মোটর রেখে আমরা উপরে হেঁটে উঠলাম। বাগানে এ সময় বেশী কিছু ফুল নেই, তবে উপর থেকে নীচে সমুদ্রের ও কোবে সহরের দৃশ্যটা অতি মনোরম।

পাহাড়ের উপরে একটা সিন্তো ধর্ম্মের মন্দির আছে। সেটা অতি যত্ন সহকারে রাখা হয়েছে। অন্ধকার হয়ে আস্‌ছিল, আর কিছু দেখা

হ'ল না। আমরা মিঃ কাঁগাওয়ার সঙ্গে হোটেলে ফিরে এলাম। যে কন্‌সার্টের কথা বল্‌ছি, তার সমস্ত খরচ পত্র বালিকাদের পিতারা একত্রে



মিঃ কাঁগাওয়া

বহন করেন। রাত্রে ডিনার খেয়ে কন্‌সার্টের আমোদ প্রমোদ সমাপ্ত হয়। যাঁরা এতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের ডিনার পৃথক ঘরে বিশেষ ভাবে তৈয়ার হয়েছিল। আমরা সেখানে যাই নি।

জাপানে ভারতবাসী

১৭ মে—

আজ সকালে বেড়াতে বেরিয়ে চিঠি ডাকে দেবার জন্য পোষ্ট আফিসে গেলাম। সেখানে ষ্ট্যাম্প কিনে চিঠি পোষ্ট বাক্সে ফেল্‌তে যাচ্ছি, হঠাৎ পিছন থেকে একজন লোক ইংরিজিতে বল্লে, "আমি চিঠিগুলি পোষ্ট করে দেব ?" আমি আশ্চর্য্য হয়ে পিছন ফিরে দেখি একটী অপরিচিত লোক এই কথাগুলি বল্‌ছে। লোকটীর পরণে বিলাতি ধরণের কাপড় কিন্তু মাথায় পাগড়ী আছে। হঠাৎ অপরিচিতের এ রকম বিনয় দেখে আমি একটু বিরক্ত হয়ে বল্লাম "না দরকার নাই"। আমি স্বামীর কাছে গিয়ে তাঁকে এই ঘটনাটীর কথা বল্লাম। তিনি ঘরের অন্য এক দিকে ছিলেন। আমার স্বামী তার পাগড়ী দেখে ভারতবর্ষের লোক কি না জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর তার সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ করে দিলেন। জানা গেল, তিনি এখানে চার পাঁচ বৎসর আছেন, তার বড় ভাই কিন্তু এখানে চৌদ্দ বৎসর বাস কচ্ছেন। তিনি বল্লেন, হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ; তা ছাড়া বিকালে তাঁর বাড়ী আমাদের চা পানের নিমন্ত্রণও হল। জানা গেল তাঁর বাড়ীতে তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী আছেন, তিনি আমাদের পেয়ে খুব খুসী হবেন। শেষে স্থির হল ভদ্রলোকটী নিজে চারটার সময় এসে তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবেন। আমরা পোষ্ট আফিস থেকে অনেক দোকান ইত্যাদি ঘুরে লাঞ্চের সময় হোটেলে ফিরলাম। জাপানের কোন্ কোন্ স্থান দেখার উপযুক্ত সেটা জানবার জন্যে টুরিষ্টদের বিয়োরোতে (Tourists Bureau) গেলাম। কিন্তু সেখানে বিশেষ সাহায্য পাওয়া গেল না। চারটার সময় ভদ্রলোকটী আমাদের নিতে এলেন। চারখানা রিক্সাতে আমরা গেলাম। এঁদের বাড়ীটী সুন্দর ; সম্মুখেই সদর রাস্তা। ভদ্রলোকটী আমার স্বামীকে

রিক্সার ভাড়া দিতে দিলেন না, নিজেই দিলেন। ইহাঁর নাম ময়েজ আবদুল আলি, গুজরাটি মুসলমান; কিন্তু বাড়ী বোম্বেতে। এঁর বড় ভাই নজম্ আবদুল আলি এখানে দেশলাইয়ের বৃহৎ ব্যবসা করেন, দু-চার বৎসরের মধ্যে পনেরো কুড়ি লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন। মুসলমানদের প্রথায় এঁর ভ্রাতৃবধূ পরদানশীন। বড় ভাই নজম আব্দুল আলির সঙ্গেও পরিচয় হল। এঁদের বাড়িটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বিলাতি কায়দায় সাজানো। আমার স্বামী "ড্রইং রুমে" রইলেন। মিঃ নজম আব্দুল আলি আমাকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্যে খাবার



জাপানী দোকান

ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরটীও পুরো বিলাতি ধরণে সাজানো। মিসেস আবদুল আলি একটু পরে সেখানে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ

ও চা পান করা গেল। তাঁর কাছে জানলাম, এখানে প্রায় দেড়শ ঘর ভারতবর্ষীয় লোক আছে। কিন্তু অনেকেরই স্ত্রী এখানে নেই; যে কয় ঘর ভদ্রলোকের স্ত্রী আছেন, তাঁদের মধ্যেও নাকি বিশেষ বনাবন্তি নেই। আবদুল আলিরা এখানে বড়ই একা বোধ করেন, তাই ভারতবর্ষীয় লোক দেখলে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে এঁদের এত আগ্রহ। যা হোক এঁদের খুব ভালই লাগল।

মিসেস্ আবদুল আলি তাঁদের সব ঘর আমাদের দেখালেন। তাঁরা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন। মিঃ আবদুল আলি বল্লেন, এখানে ভারতীয়দের মধ্যে তিন-চার জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকও আছেন। আমার স্বামীর অনুরোধে আবদুল আলি টেলিফোন্ করে তাঁদের এখানে আস্তে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল একটী ভদ্রলোক এলেন। তাঁর নাম সুশীল দাস। ইনি Dawn Companyর আফিসে চাকরি করেন। মিঃ আবদুল আলির রোজা ভঙ্গ করবার সময় হলো, সে জন্য আমরা তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। মিঃ দাস আমাদের সঙ্গে করে ভারতীয় ক্লাবে নিয়ে গেলেন। ক্লাবটী বিশেষ ভাবে পুরুষদের জন্যই, তবে সপ্তাহে এক দিন মহিলারাও আসেন। ক্লাবের বাড়ীটী বেশ বড়।

কয়েক জন ভদ্রলোক ব্যাড্মিন্টান ও কয়েকটী ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বিলিয়ার্ড খেলছিলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানের লোক এখানে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন এখান থেকে চলে যাচ্ছেন, সেই উপলক্ষে কয়েক জন তাঁকে বিদায়-ভোজ দিচ্ছেন। আমাদেরও এই ভোজে যোগ দেবার জন্যে নিমন্ত্রণ হ'ল। কিন্তু আমি সম্মত হলাম না; আমার স্বামী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনি মিঃ দাসের সঙ্গে ডিনার খেয়ে রাত দশটায় ফিরেছিলেন। শুনলাম সেখানে নিরামিষ ভোজ হয়েছিল, তার উপর গান বাজনাও চলেছিল।

জাপানী পরিবার

১৮ই মে—

এখানে মোতোমাচি নামে একটা রাস্তা আছে, তার দু'ধারেই কেবল নানা জাপানি জিনিষের দোকান। এ রাস্তাটাতে কোন রকমের গাড়ী বা মোটর চালান নিষিদ্ধ। এখানে নানা শ্রেণীর মহিলাকে বাজার করতে দেখা গেল। এ পর্য্যন্ত আমরা কোনো জাপানি ভদ্র পরিবারের বাড়ি-ঘর দেখিনি। মিঃ কাঁগাওয়াকে অনুরোধ করলাম, তিনি যদি এর একটা ব্যবস্থা করে দেন। তিনি খুব আহ্লাদের সঙ্গে বল্লেন, আমরা যদি তাঁর কুটীরে যাই, তবে তিনি ও তাঁর স্ত্রী খুব খুসী হয়ে সব দেখাবেন। কাঁগাওয়ারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ,—ধনী লোক নন্। ভদ্র গৃহস্থের বাড়িই আমাদের দেখার ইচ্ছা ছিল। সে জন্যে আনন্দের সহিত তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলাম তিনি আমাদের লাঞ্চের পর তাঁর মোটর নিয়ে আমাদের নিতে এলেন। তাঁর বাড়ি পর্য্যন্ত মোটর যায় না, কারণ বাড়িটা একটা পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ের নীচে গাড়ি রেখে, আমরা একটা গলি দিয়ে প্রায় সিকি মাইল হেঁটে গেলাম। গলির চারদিকে লোকের বাড়ি। গলির রাস্তাটার অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু এঁদের বাড়ি দেখে আমরা চমৎকৃত হলাম। বাড়ির সম্মুখে সুন্দর ছোট একটা জাপানি বাগান। বাড়িটা কাঠের এবং দরজা ও জানলা কাগজ দিয়ে তৈরি। দরজাগুলোকে আমাদের দেশের দরজার মত খোলা যায় না, ঠেলে সরিয়ে দিতে হয়। এ দেশের দরজা কেহই ভিতর থেকে বন্ধ করে না, কারণ চোরের উপদ্রব নেই। ইংরিজিতে যাকে "স্লাইডিং ডোর" (ঠেলা দরওয়াজা) বলে এখানে সব বাড়িতেই সেই রকম দরজার ব্যবস্থা আছে। দরজার ফ্রেম্‌টা কাঠের,

কিন্তু বাকি সবই কাগজের টুকরো দিয়ে তৈরী। আমরা বাড়ীতে ঢুকবার আগে সিঁড়ির উপরে আমাদের জুতো খুলে যেতে হ'ল। সিঁড়ির উপরে নানা মাপের জাপানি জুতো (sandal) সাজান রয়েছে। জাপানিরা ঘরে ঢুকবার আগে জুতা খুলে রেখে যায়, বাহিরে যাবার সময় আবার তাই পরে বাইরে আসে। তাই এঁদের ঘরে ময়লা প্রবেশ করতে পারে না। রাস্তায় সব জাপানীরই পায়ে জুতো বা খড়ম থাকে, কিন্তু বাড়িতে কেহই আমাদের মত জুতো বা খড়ম পায় দিয়ে খট্ খট্ করে বেড়ায় না। হয় পা খালি রাখে, না হয় এক রকম মোজা পায় দিয়ে ঘরের ভিতর চলা ফেরা করে। ঘরের মেজেটা আমাদের দেশের মাতুরের মত মাতুর দিয়ে সমস্তটাই ঢাকা। মাতুরটা একেবারে চক্‌চকে পরিষ্কার। ঘরে আসবাব নেই বললেই হয়। আমরা প্রথমে যে ঘরটীতে ঢুক্‌লাম, সেটীতে একটী বইয়ের আলমারি ও একটা গ্রামোফোন আছে ও দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা দুটি কোতো যন্ত্র আছে; সে গুলি আবার সুন্দর কাপড়ের ঢাক্‌না দিয়ে ঢাকা। বাস্, এ ঘরে আর কিছুই নেই। তার পরে, এরই পাশের ঘরে আস্‌বাব নেই বললেই চলে। মেজেতে মাতুরের উপর চারখানি গোল গদি আমাদের জন্য পাতা রয়েছে মাত্র। দেয়ালের গায়ে একটা বড় কুলঙ্গি; তারি মধ্যে একখানি ছবি টাঙ্গান আছে। ছবিটি একটী জাপানি যুদ্ধের পোষাক। ছবির নীচে মাটিতে একটা থালার আকারের জিনিষে জল রেখে তার মধ্যে ফুল সাজানো রয়েছে, দেখ্‌লে মনে হয় যেন ফুলগুলি জলে ভাস্‌ছে। বাহুল্য বর্জ্জিত করে ঘর দুয়ার সাজানো জাপানিদের একটা বড় বিশেষত্ব। কতকগুলো হাব্‌জা গোব্‌জা জিনিসে ঘর বোঝাই হলে, আমরা মনে করি বুঝি খুব সুন্দর করে ঘর সাজানো হয়েছে। কিন্তু জাপানিরা তা মনে করে না—তাদের মতো সৌন্দর্য্যের সমজ্‌দার জাতি বোধ করি এ পৃথিবীতে আর একটি নেই। এদের ঘর

দুয়ারগুলিতে আমরা তার পরিচয় পেলাম। জাপানিদের মধ্যে "সেরিমোনিয়েল্ টি" বলে একটা চা প্রস্তুত করার অনুষ্ঠান আছে। ইহা মিসেস্ কাঁগাওয়া আমাদের দেখালেন। এই অনুষ্ঠানে নির্দ্দিষ্ট রীতিতে বাড়ির

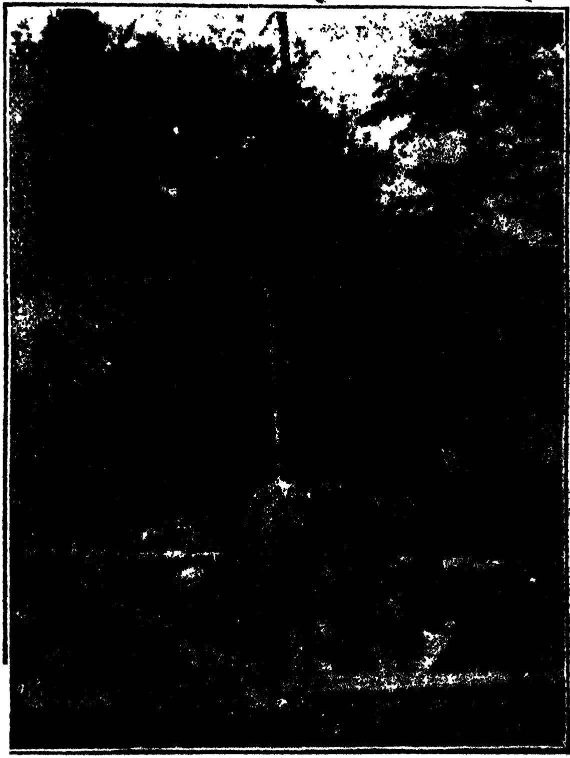


কাঁগাওয়াদের বাগানে স্বামী পুত্রসহ সুরোজনন্দিনী ও শ্রীমতী কাঁগাওয়া

গৃহিনীকে চা প্রস্তুত করে তাঁর অতিথিদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়িত করতে

হয়। এই চায়ের অনুষ্ঠানটী প্রায় সব ভদ্র ঘরের মহিলারা শিক্ষা করেন। মিসেস্ কাঁগাওয়া বাড়ির গৃহিনী। কাজেই চায়ের অনুষ্ঠান তাঁকেই করতে হল। প্রথমে তিনি এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করে তাঁর নিকটে যে অতিথি বসেছিলেন তাঁকে দিলেন। তারপর তাঁর খাওয়া হলে, সেই বাটিটাই ভিজে কাপড়ে মুছে আবার চা তৈরি করে অন্য এক জনকে দিলেন। এই রকম যতক্ষণ সব অতিথিকে চা দেওয়া শেষ না হল, ততক্ষণ গৃহিনীকে নীরবে এ কাজ করতে দেখ্‌লাম। তিনি অতি ধীর ও সুন্দর ভঙ্গীতে এই কাজগুলি করতে লাগ্‌লেন। ভদ্র জাপানি গৃহিণীরা যে কত ধীর, কত নম্র এবং তাঁহাদের হাত পায়ের গতি যে কত সংযত ও সচ্ছন্দ তা' আজকার চায়ের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ দেখ্‌লাম। পেয়ালাটাকে যে নামমাত্র ধুয়ে চা পরিবেশণ করা হ'ল—এইটাই আমার কিছু খারাপ লাগ্‌ল। স্বাস্থ্য হিসেবে এটা ভাল নয়। চায়ের সঙ্গে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈয়ারি এক রকম জাপানি মিষ্টান্নও খাওয়া গেল। যা' হোক্ চায়ের পর কাঁগাওয়াদের সমস্ত বাড়ী এমন কি রন্ধনশালা পর্য্যন্ত দেখ্‌লাম। সমস্ত ঘরদোরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শোবার ঘরে খাট বিছানা কিছুই নাই। জাপানিরা খাটে ঘুমান না। মাটিতে বিছানা করে ঘুমান। সাপ মশা বা পোকা মাকড়ের উপদ্রব নেই, সেটা এদের অত্যন্ত সৌভাগ্য। শোবার ঘরে বিছানা বালিশ স্তূপাকার করে রাখার রীতিও এঁদের মধ্যে দেখা যায় না। দেওয়ালের গায়ে ঠেলা দরজাওয়ালা আলমারি থাকে, ইহাঁরা দিনের বেলায় তারি মধ্যে সব বিছানা কাপড় রেখে দেন, তারপর রাত্রে শোবার আগে বিছানা বের করে পাতেন। সমস্ত দিন বিছানা-পত্র সব ভিতরে বন্ধ থাকে বলে ঘর বেশ সুন্দর ও পরিপাটী থাকে। জাপানিরা খুব পরিষ্কার অথচ খুব অল্প ব্যয়ে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করেন, এটাই হলো তাঁদের বাহাদুরী। আমাদের

দেশে এর সম্পূর্ণ অভাব। যাঁরা পাশ্চত্য ধরণ অনুকরণ করেন, তাঁদের যেমন ব্যয়ের অতিরিক্ত হয় তেমনি পরিচ্ছন্নতার মাত্রা কমিতে থাকে।



কাঁগাওয়াদের বাগানে সরোজনলিনীর স্বামী

আমরা নিজেদের দেশের ধরণে থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর যদি মনোযোগ দিতে পারি তা হলে বোধ হয় জাপানিদের মত অল্প ব্যয়ে

সাদাসিদে ভাবে জীবন যাপন কর্‌তে পার্‌বো। যা হোক্, মিঃ ও মিসেস্ কাঁগাওয়া সামিসেন্ যন্ত্র বাজিয়ে আমাদের শোনালেন এবং সঙ্গে গানও করলেন। আমরা জাপানি গানের মিষ্টতা উপভোগ কর্‌তে পার্‌লাম না,—বাজনাটা যেন আমাদের দেশের বাজনার চেয়েও একঘেয়ে মনে হল। গান-বাজনার পর আমরা তাঁদের বাগানটা দেখলাম, অতি চমৎকার বাগান! অল্প জায়গায় কেমন পরিপাটিরূপে সাজিয়ে বাগান করেছেন। জাপানি বাগান মাত্রেই দেখবার জিনিষ। আমার স্বামী তাঁহাদের বাগানের কয়েক খানি ছবি তুললেন। বাগানেতে একটী ছোট টেবিল ও কয়েকখানি চৌকি ছিল। আমরা সকলে সেখানে বসে বাগানের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌তে কর্‌তে ষ্টবারী ফল ও ক্রীম আহার কর্‌লাম। এ দেশে খুব চমৎকার ষ্টবারী ফল হয়। অনেক রকমের বিলাতি ফল জাপানিরা এদেশে জন্মাচ্ছে। লকেট ফলও এখানে খুব প্রচুর পরিমাণে



বাগানে সিন্তো-মন্দির প্রান্তে শ্রীমতী কাঁগাওয়া

পাওয়া যায় এবং সে ফলগুলি আমাদের দেশের চেয়ে খুব বড় এবং সুস্বাদু হয়। আম কিন্তু এদেশে জন্মে না। মিঃ কাঁগাওয়া :আমাদের আবার তাঁর মোটরে করে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। এঁদের আদর যত্নে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আরিমা

১৯শে মে—

আজ সকালে আমরা মিঃ আব্দুল আলির সঙ্গে তাঁর মোটরে কোবে থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে বেড়াতে গেলাম। সেখানে একটা ঝরণা আছে, সেটাই দর্শনীয় বস্তু। জায়গাটার নাম আরিমা। আব্দুল আলি কিছু খাবার সঙ্গে নিয়েছিলেন, পথে একটা বড় জলাশয়ের ধারে বসে, তাই খাওয়া গেল। দেখ্‌লাম, একজন জাপানি চাষা একটা গাড়ি চালাচ্ছে। এ দেশে গাই এবং বলদের বড় অভাব, তাই গাড়ি মানুষেই ঠেলে নিয়ে যায়। গরুর গাড়ি নেই।

মাঠে চাষ দেবার জন্যে কদাচিৎ বলদের সাহায্য নেওয়া হয়। আমরা কেবল দুই চারিটি জায়গায় গরু দিয়ে লাঙ্গল চালাতে দেখেছি। এদেশে গরুর অভাবে দুধেরও অত্যন্ত অভাব। জাপানি শিশুরা গরুর দুধ খায় না। মায়ের দুধ ছাড়লেই ভাত খেতে আরম্ভ করে। আমাদের কাছে এটা খুবই আশ্চর্য্য মনে হল। মিঃ আব্দুল আলি বেশ ভাল জাপানি ভাষা বল্‌তে পারেন; তাঁর সাহায্যে আমার স্বামী এক গ্রামবাসীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ কর্‌লেন। লোকটা বেতের জিনিষ তৈরি করে। তিন ইয়েন্‌ তার দৈনিক উপার্জ্জন। তিন ইয়েনের দাম প্রায় চার টাকা। কথাবার্ত্তায় জানা গেল, এ দেশের শ্রমজীবীরা আমাদের দেশের শ্রমিকদের মত অভাবে কাটায় না,—এরা খুব আরামে সচ্ছল অবস্থায় জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

আরিমা জায়গাটা একটা বড় গ্রাম। সেখানে যে ঝরণা আছে, তা' দেখতে অনেক লোক আসে। তাই এখানে একটা জাপানি হোটেলও আছে। সে হোটেলে তিন চারটী য়ুরোপীয়ও আছেন, দেখা গেল।

আমরা হোটেলের দাম দস্তুর জানবার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম; কিন্তু হোটেলটা সুবিধা রকমের বলে মনে হলো না। সেখান থেকে আমরা ঝরণাটা দেখতে গেলাম। জলে গন্ধক আছে, সে জন্যে এর জল খুব স্বাস্থ্যকর। লোকে এই জলের জন্যেই এখানে এসে দু-দশ দিন বাস করে যায়। ঝরণার আকরিক জল একটু চিনি দিয়ে আমাদের খেতে দিলে,—



জাপানের চাষ প্রণালী

স্বাদটা সোডা-জলের মত লাগ্‌ল। এ দেশের লোক খুব ব্যবসা জানে। ঐ জল ও চা খাবার দোকানও আছে। তাকে বলা হয় "চা ঘর"। দু তিন জন জাপানি স্ত্রীলোক সেখানে থাকে, তারা পথিকদের চা বা জল দেয়,—বলা বাহুল্য তার জন্য অবশ্যই দাম নেয়। চা-ঘরটা ঝরণার পাশেই, সেখানে যে জাপানি স্ত্রীলোকটি ছিল, সে আমাদের সকলকে এক গ্লাস করে সেই জল চিনির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। ঝরণা থেকে একটা কাঠের হাতা দিয়ে জল তুলে গ্লাসে রাখ্‌লে। মিঃ আব্দুল আলি ...

বোতল এনেছিলেন। তিনি বোতলে ঝর্ণার জল ভরে নিলেন, বাড়িতে নেবার জন্যে। জাপানি মেয়েরা সচরাচর দেখ্তে সুন্দর হয় না, কিন্তু এ মেয়েটা দেখ্তে মন্দ নয়। তার ছবি নিতে যাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু সে নিতে দিলে না; পালিয়ে গেল। আমরা প্রায় সাড়ে চারটায় কোবেতে ফিরলাম। মিঃ আব্দুল আলিরা আমাদের অনেক সাহায্য করছেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলে আমাদের নানা অসুবিধা ঘট্ত। কোবেতে যে কয়েক দিন ছিলাম আমরা প্রায় রোজই এঁদের বাড়ি নিমন্ত্রিত হয়েছি। জাপানে ধোপার খরচ বড় বেশি, বিশেষতঃ হোটেলে। আব্দুল আলিরা নিজেদের ধোপা দিয়ে আমাদের কাপড় ধুইয়ে দিতেন।

মেয়েদের হাই স্কুল

২১শে মে।—

আজ সকালে আমরা মিঃ কাঁগাওয়ার সঙ্গে মেয়েদের হাই-স্কুল দেখ্‌তে গেলাম। মিঃ কাঁগাওয়া আগেই সব বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমরা তাঁরি মোটরে বার হলাম। স্কুল পৌঁছতে দশটা বেজে গেল। মিঃ কাঁগাওয়া কারবারী লোক, তাঁর সময় অতি মূল্যবান, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কাজ বন্ধ রেখে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এমন স্বার্থত্যাগী উদার লোক নিজেদের দেশে খুব কমই দেখেছি।



মেয়েদের হাই-স্কুলের ফটক

মেয়েদের হাই স্কুলটা একটা বেশ বড় রাস্তার ধারে। ফটক দিয়ে প্রবেশ করে বেশ প্রকাণ্ড বাগান ও মেয়েদের খেলবার জায়গায় উপস্থিত

হওয়া যায়। স্কুলের বাড়িটা কাঠের তৈয়ারি বটে কিন্তু সে এক বৃহৎ ব্যাপার! এমন হাই-স্কুল বাড়ি আমরা আগে কখনো দেখিনি। আমাদের দেশের অনেক পুরুষদের কলেজও এর কাছে হার মানে। মিঃ কাঁগাওয়া প্রিন্সিপ্যালের ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে বল্লেন, আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি এবং স্কুল দেখতে ইচ্ছা করি। এত বড় হাই-স্কুলের যিনি প্রিন্সিপ্যাল তিনি ইংরিজি জানেন না! আমাদের দেশে এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনেই হত না, কিন্তু এখানে সেটা সত্য। ভদ্র-লোকটীর নাম মিঃ সিনোহরা। পরস্পর কথাবার্ত্তা বল্‌তে না পার্‌লেও তিনি আমাদের যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা কর্‌লেন এবং আমরা তাঁদের স্কুল দেখ্‌তে ইচ্ছা করি শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন। মিঃ সিনোহরা লোকটী বৃদ্ধ। তিনি ইংরাজি জানেন না, সে জন্য স্কুলে যে শিক্ষয়িত্রী ইংরিজি পড়ান তাঁকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌লেন ও আমাদের তিনি সমস্ত দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিবেন বল্‌লেন। আমরা সকলে বস্‌লে, প্রিন্‌সিপ্যাল আমাদের প্রত্যেককে এক একটী ফুল উপহার দিলেন, এবং নিজের হাতে চা তৈয়ার করে খেতে দিলেন। আমরা সাধারণতঃ যে চা খাই এ চা সে রকম নয়। ইহার সঙ্গে দুধ-চিনির একটুও সম্বন্ধ থাকে না। চায়ের সবুজ গুঁড়ো পাতা গরম জলে ফেল্‌লেই জাপানি চা তৈরি হয়। আমাদের কাছে এই চায়ের স্বাদ একটুও ভাল লাগে না। জাপানিরা কিন্তু সর্ব্বদাই এই চা খান।

চা খাবার পর ওঁরা আমাদের সঙ্গে করে স্কুলের কয়েকটা ক্লাসে নিয়ে গেলেন। এ স্কুলে ৭৫০টী মেয়ে পড়ে। অধিকাংশই বাইরে থেকে এসে পড়ে। কেবল ৩০|৪০টী বোর্ডার আছে। ইংরেজি পড়াবার শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ মুকামোটো আমাদের ইংরিজি ভাষায় স্কুলের বিষয় সব

বুঝিয়ে দিলেন। কয়েকটা ক্লাস দেখ্‌বার পর মেয়েদের ড্রিল্‌ দেখ্‌বার জন্য আমরা আর একটা ঘরে গেলাম। সেটা স্কুলের "জিম্‌নেসিয়াম" (ব্যায়াম-ঘর)। প্রকাণ্ড ঘর। একটা ড্রিল্‌-শিক্ষয়িত্রী প্রায় ২০০ মেয়েকে ড্রিল শেখাচ্ছেন। সে দৃশ্য অতি চমৎকার। দেখে একদিকে খুব আনন্দ হল; যখন আবার আমাদের দেশের বালিকা-বিদ্যালয়-গুলির শোচনীয় অবস্থার কথা মনে হলো তখন মন বড়ই ক্ষুন্ন হতে লাগলো। স্কুলের মেয়েরা তাদের দেশের কিমোনোর উপর একটা আল্গা স্কার্ট্‌ (ঘাঘ্‌রা) পরে; এতে চলা ফেরা করতে কোন বাধা হয় না। এই আল্গা



স্কুলের পোষাকে জাপানী ছেলে ও মেয়ে

স্কার্ট্‌ই হলো মেয়েদের স্কুলের পরিধেয় পোষাক। মেয়ে যত বড় বা ছোট হোক্‌ স্কুলে স্কার্ট্‌টা পরতেই হবে। ড্রিলের সময় মেয়েরা কিমোনোর উপর একটা খুব আল্গা 'নিকার" প্যাণ্টলুন পরে ড্রিল করে। ড্রিল শিক্ষয়িত্রী

তাই পরেন। এ পোষাক পরে ড্রিল করলে বেশ চটপটে দেখায়। মেয়েদের ২০।২২ বৎসর বয়সের আগে বিবাহ হয় না।' সে জন্য ওরা ২০।২২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিক্ষা সমাপ্ত করে না। এই জাপানি বালিকাদের দেখে আমাদের সুদূর ভারতবর্ষের সেই ছোট ময়লা বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সেই ছোট ছোট রোগা শিশুগুলির কথা মনে হয়ে দেশের জন্য বড় কষ্ট হতে লাগ্‌ল। আরও কত দিনে আমাদের দেশের লোক নারী-শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করবে? কবে এমনি একাগ্র চিত্তে নারীদের শিক্ষা দিবে? এই সুস্থ সবল জাপানি বালিকারাই একদিন জাপানের মাতা হবে। জাপানিরা তা উপলব্ধি করে তাদের কন্যাদের সেই মাতৃ-স্থান পূর্ণ কর্‌বার যোগ্য করে তুল্‌ছে। জাপানিরা কি সহজে আজ জগতে এত বড় স্থান অধিকার করেছে? এদের শিক্ষার কি গুণ! বালিকাগুলির মুখে কেমন প্রফুল্ল ভাব! আর তার সঙ্গে তাদের মুখে জ্ঞানের আলো যেন ফুটে পড়্‌ছে মনে হয়। শিক্ষয়িত্রী এবং বালিকা-গুলি আমাদের সম্মুখে অতি সুন্দর ভাবে ড্রিল ব্যায়াম করে দেখালেন। বিজ্ঞানের ল্যাবোরেটারির ঘরটা আমরা দেখ্‌লাম। এই হাই-স্কুলের লেবোরেটারির মত আমাদের দেশের অনেক কলেজেও লেবোরেটারি নাই, স্কুল ত দূরের কথা। এখান থেকে তাদের গান বাজনা দেখ্‌বার ঘরে গেলাম। এক ঘর মেয়ে গান শিক্ষা কর্‌ছে। একজন জাপানি পুরুষ পিয়ানো বাজাচ্ছিল ও মেয়েরা বেঞ্চে বসে গান শিক্ষা কর্‌ছে। স্কুলে যে সব গান শেখায় তার ভাষা জাপানি বটে, কিন্তু সুর ইংরাজি 'হিমের' (ধর্ম্ম সঙ্গীতের) অনুকরণ। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে জাপানিরা সঙ্গীত-চর্চ্চায় এখনও পশ্চাৎপদ আছে; তাদের ভিতরে সঙ্গীত জিনিসটার অভাব আছে মনে হয়। সে জন্যই হয় ত তারা বিলাতি-সঙ্গীতের অনুকরণ কর্‌ছে। এই ঘরের পাশে দুটো ছোট ঘরে

একটী করে পিয়োনো আছে। এগুলি মেয়েদের আলাদা করে পিয়োনা বাজাতে শেখবার জন্যে। জাপানিদের পরদা নাই; সে জন্য স্কুলে মেয়ে ও পুরুষ দুই রকমেরই শিক্ষক আছে। এঁদের কয়েক জন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আমেরিকায় গিয়ে শিক্ষা করে এসেছিলেন। তাঁরা আমেরিকার প্রণালী অনুসারে নিজেদের স্কুলে শিক্ষা বিস্তার করচেন। স্কুল দেখা হলে মিসেস্ সুকামোটা আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ঘরটায় চেয়ার টেবিল। মিসেস্ সুকামোটো খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ও



জাপানী মেয়ের বিবাহের সাজসজ্জা

এমেরিকাতে ৪ বৎসর শিক্ষা করে এসেছেন। ইনি আমাদের খুবই যত্ন করলেন এবং শেষে আমার স্বামীকে বালিকাদের সাম্‌নে ভারতবর্ষের বিষয় কিছু বল্‌তে অনুরোধ করলেন। সেখানে প্রায় সাড়ে সাত শত বালিকা উপস্থিত ছিল। ভারতবর্ষের উপর জাপানিদের খুবই শ্রদ্ধা

দেখ্‌লাম; কারণ তাদের বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তিই ভারতবর্ষে। আমাকে মিসেস্ সুকামোটো একটা বাংলা গান করতে বল্‌লেন এবং তার পর এখানেই জাপানি "লাঞ্চ্" (মধ্যাহ্ন ভোজন) খেয়ে আরও দু একটা ক্লাস দেখে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। লাঞ্চ্ খেতে আমরা একটু আপত্তি করলাম; কিন্তু উনি কিছুতেই শুন্‌লেন না। অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায় আমরা সম্মত হলাম। এখন আমাদের দোতলার একটা প্রকাণ্ড হল্ ঘরে নিয়ে গেলেন; সেখানে প্লাটফরমের উপর একটা পিয়ানো ছিল ও কয়েকটা চেয়ারও ছিল। আমাদের সকলকে সেই প্লাটফরমের উপর বসালেন। তারপর স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ সিনোহরা মেয়েদের কাছে জাপানি ভাষায় আমাদের পরিচয় দিলেন এবং মিঃ কাঁগাওয়াও আমাদের বিষয় মেয়েদের কাছে দু চারটা কথা বল্‌লেন। কি বল্লেন তা আমরা সব বুঝ্‌লাম না, কারণ বক্তৃতা জাপানি ভাষাতেই হল। আমার স্বামীকে ওঁরা ভারতবর্ষের বিষয় কিছু বল্‌তে অনুরোধ করেছিলেন, সে জন্য তাঁকে কিছু বল্‌তে হল। উনি যা বল্‌লেন তার মর্ম্ম এই যে, জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের বুদ্ধ হতে এক মহা বন্ধন আছে, সে জন্য জাপানি ও ভারতীয় লোকের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব সম্বন্ধ থাকা দরকার।—তা ছাড়া তিনি ভারতবর্ষের মহিলাদের বিষয়ও কিছু বল্‌লেন। ভারতীয় মহিলারা যে জাপানি মেয়েদের মত ভাল শিক্ষা পাচ্ছেন না, তাও উল্লেখ করলেন। আরও দু চার কথা বল্‌বার পর আমি রবিবাবুর "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী" গানটা গাইলাম। তার পরও ওঁরা আবার গাইতে অনুরোধ করলেন, তখন, "তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা" গানটা গাইলাম। মেয়েরা সমস্ত সময় একাগ্র চিত্তে ওঁর বক্তৃতা ও আমার গান শুন্‌লে এবং শেষে খুব হাততালি দিলে। জাতীয় স্বভাব গুণেই হোক্ বা শিক্ষা গুণেই হোক জাপানি মেয়েরা সমস্ত সময়টা

চুপচাপ করে বক্তৃতা ও গান শুন্‌লে, হাসি ঠাট্টা বা অন্য গোলযোগের একটুও আওয়াজ পাওয়া যায়নি। আমাদের দেশে এত ছেলে মেয়ে এক ঘরে থাক্‌লে কি রকম গোলমাল ও গল্প হোত, তা বোধ হয়.. যিনি আমাদের কোন বড় স্কুলে গেছেন তা বেশ বুঝ্‌তে পারেন। একাগ্র চিত্তে কোন বিষয় শোন্‌বার ও শিখ্‌বার ইচ্ছা আমাদের দেশের ছেলে মেয়ে-দের মধ্যে খুব কম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঠাট্টা বিদ্রূপ ও হাসি ঠাট্টাটাই ওদের স্বভাবগত। আমার গান শেষ হলে একটা মেয়ে এসে আমাকে একটা ফুলের তোড়া দিল, তার পর আমাদের "লাঞ্চ্" খাওয়াতে

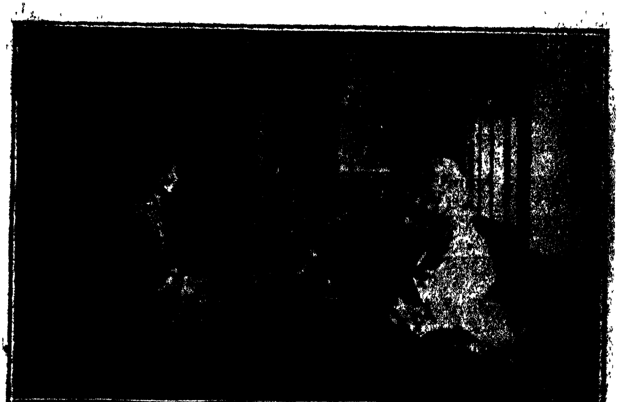


জাপানের আহার প্রণালী

মিসেস্ সুকামোটো অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। মিঃ কাঁগাওয়ার কাজ ছিল; সে জন্যে তিনি চলে গেলেন। যে ঘরটাতে মিসেস্ সুকামোটো 'লাঞ্চ্' খাওয়াতে নিলেন সেটাতে জাপানি আদব কায়দা এবং সেরিমোনিয়েল চা কেমন সুচারুভাবে পরিবেশন করতে হয় তা মেয়েদের

শিক্ষা দেওয়া হয়। ঘরের সমস্ত মেঝেতে মাদুর পাতা আছে। তারই উপরে তিনটা ছোট গোল গদি পাতা ছিল, আমাদের বস্‌বার জন্য। আমরা বস্‌লে তাঁরা তিনটা "ট্রে" এনে সামনে দিলেন, তাতে চারটা করে চিনে মাটির বাটি ছিল; একটাতে ভাত, একটাতে মাছের সুরুয়া, ও অন্য দুটো বাটিতে মাছের তরকারির মত কিছু ছিল। কিন্তু খাবার গুলিতে এত খারাপ গন্ধ লাগ্‌লো যে আমার পক্ষে তা খাওয়া অসম্ভব হল। খাতিরে পড়ে একটু ভাত মাত্র মুখে দিলাম, সুরুয়া ও তরকারিগুলো নাম মাত্র ছুঁলাম। এই গন্ধের চোট সামলাতে আমার কিন্তু চার পাঁচ দিন সময় লেগেছিল। যা খেতাম তাতেই এই ভয়ানক গন্ধ অনুভব কর্‌তাম। আমাদের খাবার জন্য চপ্‌ষ্টিক্‌ দিয়েছিল; কিন্তু আমি তা ব্যবহার কর্‌তে পার্‌লাম না, সে জন্য তাঁরা আমার জন্য একটা চামচ্‌ এনে দিলেন। আমার স্বামী কোন প্রকারে চপ্‌ষ্টিক্‌ দিয়ে খেলেন। জাপানি খাবার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হলো এরপর আর জাপানি খাবার খাবো না প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম। খাওয়ার পর আমরা পাশে একটা ঘরে একটু বিশ্রাম কর্‌তে গেলাম; সে ঘরে কয়েকটি চৌকি টেবিল্‌ ছিল। ওখানে থেকে একটা পুরুষ শিক্ষক এসে মেয়েদের "সেরিমোনিয়েল্‌" চায়ের অনুষ্ঠান শিক্ষা দেন। তিনি এলে কয়েকটা জাপানি মেয়ে তাঁর কাছে শিক্ষা কর্‌লে। আমরা তাও দেখ্‌লাম। মিসেস্‌ সুকামোটো তার-পর উপর নীচে আরও কয়েকটা ক্লাশ ঘর দেখালেন। আমরা উপরে গিয়ে দেখ্‌লাম, কয়েকজন ছাত্রী মিলে ঘর দোর পুঁছ্‌ছে, ঝাট্‌ দিচ্ছে, এমন কি বাল্‌তি করে নিজেরা জল এনে ঘরের মেঝেগুলো পর্য্যন্ত ধুচ্ছে! মিসেস্‌ সুকামোটো বল্লেন যে, এটা মেয়েদের শিক্ষার একটা অঙ্গ। আমাদের দেশে বই পড়িয়ে মুখস্থ করিয়ে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এরা বই পড়ার সঙ্গে হাতে কলমে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শিক্ষা দিচ্ছে। কি

সুন্দর শিক্ষার প্রণালী! মিসেস্ সুকামোটোর কাছে জানা গেল যে, মেয়েরা রোজ পড়া শেষ করে বাড়ি যাবার পূর্ব্বে পালাপালি করে তাদের স্কুল ঘরগুলি ধোয়। এ কাজের জন্য অন্য চাকর রাখা হয় না। আমাদের দেশে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না; সে জন্য মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই অত্যন্ত সৌখিন হয়ে দাঁড়ায়। এমন কাজ স্কুলে করতে দিলে আমাদের মেয়েদের অভিভাবকরা হয়ত তাকে অত্যন্ত অন্যায় মনে করবেন; কিন্তু এতে যে মেয়েদের চরিত্রের কত উন্নতি হয় তা ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এই সব শিক্ষার প্রভাবেই জাপানি মেয়েরা এত উচ্চ শিক্ষা সত্ত্বেও নম্রতা বজায় রাখে। মেয়েরা স্কুলে ঘরের কাজ শিক্ষা করছে, আবার লেখা পড়াও শিক্ষা করছে। এই রকমে সাধারণ



জাপানী বিবাহের সম্প্রদান

শিক্ষার সঙ্গে নম্রতা বজায় রাখ্‌তে শিক্ষা করাই হচ্ছে নারীর আদর্শ শিক্ষা। হায়, আমাদের অভাগা দেশের কবে চক্ষু খুল্‌বে! কবে আমরা এমনি ভাবে মেয়েদের শিক্ষা দিতে শিখ্‌ব? যে দিন আমরা আমাদের

দেশের বালিকাদের এমনি যত্ন করে শিক্ষা দিতে পারব সে দিন এখনও কি অনেক দূরে আছে? যা হোক শিক্ষায় আমরা এখনও যে কত পশ্চাদ্‌পদ, তা এই রকম স্কুল দেখ্‌লে ভালরূপে অনুভব করতে পারা যায়। শিক্ষা মানুষের যে কি পরিবর্ত্তন করতে পারে তা এ দেশে এলে বোঝা যায়। ঘর দোর কেমন করে পরিস্কার করতে হয় ও পরিস্কার রাখ্‌তে হয়, তা শুধু বইয়ে মুখস্থ করেই এখানে শেষ হয় না; স্কুলে হাতে হাতে কাজ করিয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এমনি করে আদব কায়দা এবং রান্না ইত্যাদি যা মেয়েদের শিক্ষার উপযোগী তা স্কুলেই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এমন স্কুল আমাদের দেশে কোথায়?

তারপর মেয়েদের খেলা দেখ্‌তে গেলাম। বাইরে বাগানের মধ্যে খেলার জায়গা। কেউ বা "ভলি বল্‌" (এটা একটা এমেরিকান খেলা; একটা ফুটবল হাতে মেরে খেল্‌তে হয়) কেউ বা টেনিস্‌ খেল্‌ছে। লেখাপড়ার সঙ্গে এঁরা মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষারও ব্যবস্থা করেন, সে জন্যই এদেশের স্ত্রীলোকরা এমন সুস্থ ও সবল ও তাদের মুখের ভাব সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। এই জাপানি বালিকা-বিদ্যালয়টা দেখে আমাদের খুব শিক্ষা হলো। রাত্রে ডিনারে মিঃ ও মিসেস্‌ কাঁগাওয়াকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মিসেস্‌ সুকামোটো আমাদের অনেক আদর যত্ন করে স্কুল দেখিয়েছিলেন; কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে তাঁকে ও তাঁর স্বামীকেও আমরা রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ করলাম। মিঃ সুকামোটো সম্প্রতি এমেরিকা ও ইংলণ্ড বেড়িয়ে এসেছেন। এঁরা খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী; সেই জন্য স্বামীতে একটু অতিরিক্ত বিলাতি ধরণ ধারণ আছে। তাই এঁদের মিঃ ও মিসেস্‌ কাঁগাওয়ার মত খাঁটি জাপানি বলে মনে হয় না। কাঁগাওয়াদের মধ্যে কেমন একটা নম্রতা ও সরলতা আছে, যা সুকামোটোদের মধ্যে লক্ষিত হলো না। তাঁদের

অস্বাভাবিকতা আমাদের বড়ই চোখে লাগ্‌ল। দেখ্‌লাম মিঃ সুকামোটো বিলাতি নাচ গান বাজনার অত্যন্ত পক্ষপাতী। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তিনি কোথায় নেচেছিলেন ইত্যাদির গল্প করে আমাদের শুনালেন প্রায় ১১টা রাত পর্য্যন্ত গল্প করা গেল। আমি একটা লাল বেনারসী সাড়ি পরেছিলাম; সেটার ওঁরা খুব প্রশংসা করলেন। কিন্তু ওদের দেশে ভদ্রমহিলারা লাল বা অন্য কোন রঙ্গিন কাপড় পরেন না, সে জন্য লাল সাড়ি দেখে ওঁরা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিলেন, ইহাও জানিয়ে দিলেন।

কিয়োতো যাত্রা

২২শে মে—

কদিনের মধ্যে এত লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তাঁরা সর্ব্বদা আমাদের নিমন্ত্রণ করতে লাগ্‌লেন। তাতে না যোগ দিলে অভদ্রতা হয় এবং যোগ দিলে মোটেই বিশ্রাম হয় না। সে জন্য আমরা কিয়োটো চলে যাব স্থির করলাম। এখানে আমাদের সপ্তাহ কাল কেটেছে। এখনও জাপানের অনেক জায়গা দেখ্‌বার বাকি আছে। আজ মিঃ আবদুল আলিরা তাঁদের বাড়ি লাঞ্চে আমাদের ডেকেছেন। তিনি নিজে বারটার সময় আমাদের নিতে এলেন। আবদুল আলিরা আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। মিঃ আব্‌দুল আলিদের বাড়ীতেই আমরা লাঞ্চ ও চা খেলাম। রাত্রে মিঃ ঘোষ ও মিঃ দাস বলে যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করেছিলাম তাঁরা আমাদের তাঁদের বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, আমরা সেখানে গেলাম। তাঁদের পীড়াপীড়ির জন্য আমরা প্রায় আরও কয়েক দিন কোবেতে থাকব স্থির করলাম। কিন্তু রাত্রে বাড়ী এসে মনে হলো মিঃ কাঁগাওয়া বলেছিলেন যে কাল (২৩ সে মে) কিয়োটো সহরে "চেরি" নাচ হবে। এ নাচটী জাপানে খুব প্রসিদ্ধ। "গেইসা" মেয়েরা এই নাচ করে। সচরাচর "চেরি" নাচ এপ্রেল মাসে "চেরি ব্লসমের" উপলক্ষে কেবল পনর দিন ধরে চলে। কিন্তু তারপর বিশেষ কোন কারণ না হলে আর হয় না। তবে আমাদের ভাগ্যে ছিল বলে জাপানে যত রেষ্টুরাঁ ও হোটেল আছে তাদের মালিকেরা একত্রে এই নাচটার আয়োজন করেছেন। মিঃ কাঁগাওয়া আমাদের সেখানে



নিমন্ত্রণ করতে চেষ্টা করবেন বলেছিলেন। এ জিনিসটা দেখার লোভ আমরা সামলাতে পারলাম না; সে জন্য কাল সকালে কিয়োটো যাওয়া স্থির হল।

২৩শে মে—

সকালে উঠতেই মিঃ কাঁগাওয়া ফোন করে আমাদের বল্লেন যে এগারটার সময় কিয়োটো যেতে হবে; তা না হলে চেরি নাচ দেখা হবে না, দেরি হয়ে যাবে। মিঃ কাঁগাওয়ার শরীর ভাল ছিল না তাই আমাদের সঙ্গে তাঁর শালা মিঃ নাকাতানিকে কিয়োটোতে পাঠাবেন বললেন। আমরা একটার গাড়িতে যাব ভেবে কিছু ব্যবস্থা করিনি, তখনই তাড়াতাড়ি সমস্ত প্যাক্ করে নিলাম। খাওয়া শেষ করে সাড়ে এগারটায় আমরা তৈরি হলাম। মিঃ নাকাতানি তাঁদের মোটর নিয়ে এলেন, তাইতে আমরা ষ্টেসনে গেলাম। তাড়াতাড়িতে এগারটার ট্রেন ধরা গেল; কিন্তু আমাদের জিনিস পত্র সময় মত এসে পৌছল না, সে জন্য ব্রেকের জিনিষ পরের ট্রেনে আনবার বন্দোবস্ত করা গেল। আমাদের সঙ্গে চারটা বাক্স ছিল। সে গুলো প্রথমে পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে ট্রেন ছাড় ছাড় অবস্থায় হোটেলের পোর্টার সে গুলো এনে তুলে দিলে। দেখলাম শুধু একটা ছাতা চুরি গেছে।

আমরা যে ট্রেনের কামরায় উঠলাম তার দু দিকে লম্বা বেঞ্চ; তারি উপরে সকলে সারি সারি বসে আছে, প্রায় সকলেই পা নীচে রেখে বসেছে, কেবল কয়েক জন জাপানি স্ত্রীলোক পা তুলে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। আমাদের কামরায় অনেক পুরুষ ও স্ত্রী যাত্রী ছিল কিন্তু তবু মোটে গোলমাল ছিল না; সকলেই যে যার জায়গায় চুপ করে বসে ছিল, কেউই কারও সঙ্গে জোরে গল্প করছিল না; যখন কথা বলা একান্ত দরকার তখন অতি আস্তে আস্তে বলছিল। বাইরের দৃশ্য অতি সুন্দর। চারদিকে

খুব শস্য ক্ষেত্র। মাঠের প্রায় সব জমি চাষ করা হয়েছে। পড়া জমি নাই বল্লেই হয়। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাঁশের বাগান আছে কিন্তু এরা বাঁশের ঝাড় হতে দেয় না। এক একটা বাঁশ আলাদা হয়ে রয়েছে। মিঃ নাকাতানি বল্লেন, ওঁদের দেশে বাঁশের ঝাড় হতে দেওয়া হয় না কারণ তা'তে বাঁশ মোটা হয় না। সে জন্য নীচের কচি বাঁশগুলি ওরা কেটে ফেলে এবং সে গুলি ওরা তরকারি করে খায়। এদের সব কাজেই কেমন একতা আছে। তা না হলে কি দেশের এত উন্নতি হয়! আমাদের দেশে বাঁশ মোটা হলো কিনা তা দেখ্‌বার জন্য কে মাথা ঘামায়? সে জন্য আমাদের দেশে সব জিনিসই শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়। শস্যে ভরা মাঠ ও তারি মাঝে ছোটো ছোটো গ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। জায়গায় জায়গায় ফুলের বাগান ও সব্‌জির চাষ। চারদিকে সমৃদ্ধি ও উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হচ্ছে। গাড়ি চার পাঁচটা ষ্টেসনে থাম্‌লো, আবার চল্‌লো। কেউ নাম্‌লো, কেউ উঠ্‌লো, কিন্তু চেঁচামেচি হাঁক ডাক মোটেই নাই। ষ্টেসনে চা, ফল, খাবার জিনিস ইত্যাদি বিক্রী করছিল যেমন আমাদের দেশেও করে। চা জাপানি ধরণে তৈরী, এক একটা মাটীর চা-দানীতে চা আছে, সঙ্গে একটা ছোট বাটি আছে, চা পান করবার জন্য। সব শুদ্ধ চায়ের দাম বেশী নয়, অনেকেই এই চা পান কর্‌লো। এরা খুব চা খায়। ষ্টেশনে ভাত তরকারিও কিন্‌তে পাওয়া যায়। কার্ড-বোর্ডের বাক্সে তা বিক্রি হয়। অনেক পুরুষ ও স্ত্রী যাত্রী তাই কিনে গাড়িতে বসে হাতে রেখে চপ্‌ষ্টিক্ দিয়ে খেতে লাগ্‌ল। প্রথমে দেখ্‌লে এই ভাত ও শুক্‌ন তরকারি খেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু একবার যে জাপানি তরকারি খেয়েছে, সে কখনই লোভ করবে না!

আমরা প্রায় দশটার সময় কিয়োটো পৌঁছলাম। সেখানে নাম্‌তেই লোকে আমাকে হাঁ করে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আমার পরিচ্ছদ দেখে

ওদের অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছিল। কোবে একটা বন্দর, সেখানের লোক ভারতবর্ষের মহিলাদের দেখেছে, কিন্তু এখানে ভারতীয় মহিলার দৃশ্য



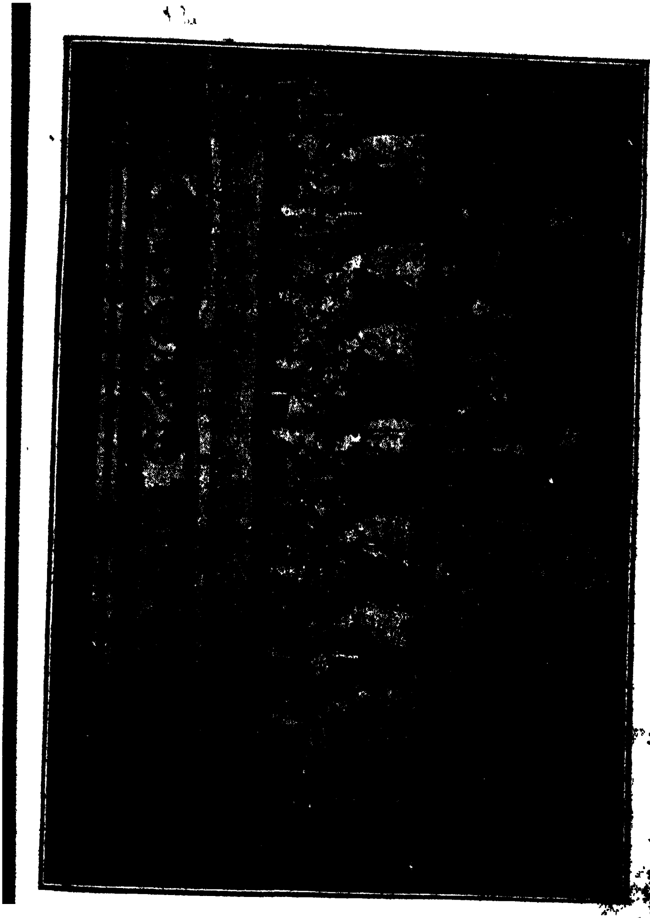
স্কুলের ছেলেরা মাঠে ফসলের পোকা বিনাশ করিতেছে

অতি দুর্লভ। একটা রিক্‌শ করে আমাদের বাক্স চারটা "ইয়ামি" হোটেলে পাঠিয়ে দিলাম। সেই হোটেলে আগে থেকেই ঘর রিজার্ভ করা হয়েছিল। এখানকার মধ্যে সব চেয়ে ভাল হোটেলের ভয়ানক দাম। রোজ ৩৫৲ ইয়েন্ লাগে। আমাদের কোবেতে তাই দিতে

প্রথমে সিন্ উঠ্‌তেই রেষ্টরাঁ-মাষ্টাররা জাপানি-ভাষায় অনেক বক্তৃতা দিলেন। সিন্ আবার যখন উঠ্‌লো, তখন একজন গেইসা একটা তক্তাপোষের উপর বসে একটা 'সামিসেন্' যন্ত্র বাজাতে লাগ্‌ল ও গান কর্‌তে লাগ্‌ল এবং আর একজন গেইসা খুব সাজ সজ্জা করে এলো। সে এসে অন্য গেইসাটীর গানের ভাব রক্ষা করে নাচ্‌তে লাগ্‌লো এবং গানের ভাব তাতে প্রকাশ পেলে। খুব ধীরে পা ফেলে হাত ঘুরিয়ে নাচ্‌লো। গেইসাদের কাপড়ের রংএর অতি চমৎকার বাহার। আর নাচটীও বড় সুন্দর, ভাবভঙ্গিগুলোও বেশ। তার পরের সিনে একজন গেইসা মেয়ে পুরুষ সেজে নাচ্‌লো এবং আগের সিনে যে গেইসা সামিসেন যন্ত্র বাজিয়েছিল সেও এদের সঙ্গে সামিসেন যন্ত্র বাজালো ও গান কর্‌লো। আগেই বলেছি, এদের সঙ্গীতটা মোটেই মিষ্ট নয়, তবে নাচটী অতি সুন্দর। নাচের মধ্যে লম্ফ ঝম্ফ মোটেই নেই। দ্বিতীয় নাচটী যতদূর বোঝা গেল, সেটী একটি প্রেমের গল্প; নাচের মধ্যে দিয়ে দেখান হচ্ছে। প্রথমে প্রেমিকরা দুজনে মিলে নাচ্‌লো, তারপর স্ত্রীলোকটি একটি কুচ্ছিৎ মুখোস্ পরে এসে পুরুষটীর কাছে তার ভালবাসা যাচাই কর্‌লো। স্ত্রীলোকটি মুখোস পরায় তাকে দেখে পুরুষটীর পছন্দ হলো না। স্ত্রীলোকটী তার কাছে যতবার গেল সে সরে গেল। শেষে বিরক্ত হয়ে পুরুষটী তাকে লাথি মার্‌লে। স্ত্রীলোকটী পড়ে গেল। যখন তার উপরের কাপড়টী সরে গেল, তখন তার নিচের কাপড় দেখে পুরুষটী তার প্রেমিকাকে চিন্‌লো এবং তাদের ভাব হয়ে গেল। এই প্রেমের কাহিনীটীর আগাগোড়া নাচ ও ভঙ্গিমা দিয়ে দেখালো হলো। কোন কথা বল্‌বার দরকার হলো না।

পরের সিন্‌টা হোলো "চেরি নাচ"। দুপাশে যে সিন্ ফেলা ছিল,

সেগুলি উঠলো। প্রত্যেক পাশে কুড়িটি করে গেইসা দেখা গেল।



[illegible] নাচের কনসার্ট। গেইশারা উপরে সামিসেন [illegible] বাজাইতেছে। নীচে নর্তকীগণ ভূমিতে উপবিষ্ট

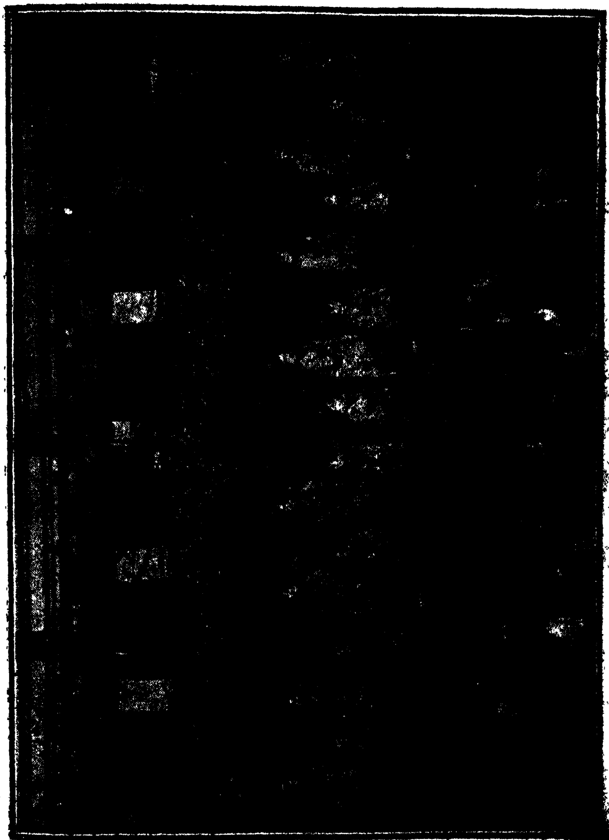
এক পাশের গেইসারা সাদা ও কালো রঙের কিমোনো পরে আর

বেঁধে বসে সামিসেন বাজালো ও সঙ্গে সঙ্গে গান করলো। অন্য দিকের গেইসারা নীল ও গোলাপী রঙের কাপড় পরে বসে বসে দু'রকমের ঢোল বাজালো। কাপড়ে রঙের সুন্দর বাহার ও সামঞ্জস্য দেখ্‌লে মুগ্ধ হতে হয়। তারপর দুদিক দিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর ত্রিশ-বত্রিশ জন গেইসা নাচ্‌তে নাচ্‌তে এলো। তাদের নাচ কি চমৎকার! ভাবভঙ্গিগুলোও বড়ই সুন্দর। নাচ্‌বার সময় মোটেই লাফালে না—সুন্দর ধীরভাবে আস্তে আস্তে পা ফেলে নাচ্‌তে লাগ্‌লো। তাদের কাপড়ের কি আশ্চর্য্য রং! কিমোনোগুলো আল্গা করে পরেছে, সে জন্য তাদের শরীরের গঠন বা পা কিছু দেখা গেল না। এদের নাচটা একটা বিশুদ্ধ শিল্প। তাতে কোনও নীচ কামনার ভাব নাই। প্রায় দশ বারটা আলাদা রকমের নাচ দেখা গেল এবং প্রত্যেক নাচের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপট বদ্‌লি হলো। সে সব দৃশ্যপটের বিষয় লিখে প্রকাশ করা যায় না,—একেবারে স্বপ্নবৎ! কি সুন্দর আস্তে আস্তে দৃশ্য বদলে যায়। সে এক অতি আশ্চর্য্য কৌশল! শেষ দৃশ্যটি চেরি ফুলের গাছে ভরা। ইহা চেরি ফুলের সময়ের মরু-য়ামা পার্কের একটি প্রকৃত দৃশ্য,—সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। মোট কথা, এমন নাচ ও সিনারি আমি জীবনে কখনও দেখিনি। বিলাতেও নাচ দেখে এসেছি কিন্তু এমন জিনিষ বড়ই দুর্ল্লভ। শুধু এই নাচ দেখ্‌লে জাপানে আসা সার্থক হয়। রাত সাতটায় সব শেষ হলে আমরা হোটেলে গেলাম। মিঃ নাকাতানি আমাদের সঙ্গে খেয়ে রাত্রেই কোবে ফিরে গেলেন। আমাদের সব বাক্স খাবার আগেই এসে পৌঁছেছিল।

২৬শে মে—

গত কাল বিশ্রাম করা গিয়েছে। আজ সকালে চিয়ন্‌-ইন্‌ মন্দিরের

ভিতর দিয়ে আমাদের সহযাত্রী একজন এমেরিকান মহিলার সঙ্গে দেখা

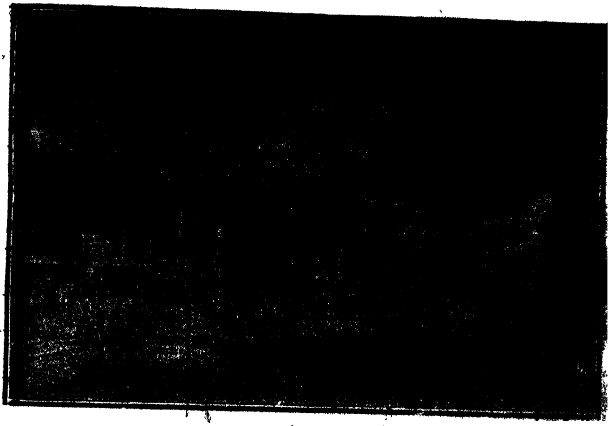


"চেরি" নাচ। (নীচে দর্শকগণ ভূমিতে উপবিষ্ট)

করতে গেলাম। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। ...ন মন্দিরটী প্রকাণ্ড। এরা মন্দিরগুলিকে অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

মন্দিরগুলি কাঠের কিন্তু অনেক রকম কারুকার্য্য তাতে দেখা যায় ভিতরে প্রায়ই বুদ্ধের একটি বেশ বড় রকমের পিতলের মূর্ত্তি থাকে। বুদ্ধ আমাদের দেশের একজন মহাপুরুষ; কিন্তু সেখানে তাঁর আদর বড় দেখা দেখা যায় না। জাপানিরা তাঁকে বাস্তবিক সম্মান দেখিয়েছে। বুদ্ধের প্রতি জাপানিদের সম্মান দেখলে মনে খুব গৌরব আসে বটে। কিন্তু আবার যখন মনে হয় আমরা ভারতীয় লোক নিজের জিনিসের মর্য্যাদা জানি না, তখন বড় ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। রাস্তায় যেতে দুটি স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে কথা হল। তারা ভাল ইংরাজি বলতে পারে না, তবু কোন প্রকারে ভাঙ্গা ভাষায় বল্লে—"আপনারা ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন?" আমার স্বামী বল্লেন, "তোমরা কেমন করে জানলে?" তারা বল্লে "আপনার মুখ দেখে ও আপনার স্ত্রীর পোষাক দেখে বুঝেছি।" তারপর তারা ভারতবর্ষের বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার স্বামীও তাদের পরিচয় ইত্যাদি এবং জাপানের বিষয় কথাবার্ত্তা বল্লেন। তারপর ওরা ওঁর কার্ড চাইলে এবং তারা নিজেদের নামও ওঁকে লিখে দিলে। জাপানে পরস্পর কার্ড বদলি করা একটা বাতিক। সামান্য পরিচয় হলেই কার্ড পরিবর্ত্তন করতে হয়। ছেলে দুটীর বয়স ১৬।১৭ হবে; বেশ ভদ্র ও অমায়িক। এক দিন হোটেলে এসে সাক্ষাৎ করবে বল্লে। এমেরিকান মহিলাটির সঙ্গে দেখা করে আমরা আর এক দম্পতি সহযাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে মিয়াকো হোটেলে গেলাম। মিয়াকো হোটেলটি খুব উঁচুতে একটি পাহাড়ের উপরে। কিয়োটো সহরটি উঁচু নিচু পাহাড়ী জায়গার উপরেই আছে। এ হোটেলটী খুব সুন্দর, কিন্তু ৩৫ ইয়েন দিন চাইলে আমাদের ছোট্ট পরিবারটির জন্যে। আমাদের সহযাত্রিদের সঙ্গে দেখা হল। লাঞ্চের আগেই আমাদের সহযাত্রী যে জাপানি পুরুষটির কথা আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম তিনি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি

ওসাকাতে থাকেন এবং আজ আমাদের ওসাকা দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আসবেন পূর্ব্বেই এই ঠিক হয়েছিল। বেশী সময় ছিল না এবং আমরা ক্লান্ত হয়েছিলাম, সে জন্যে আজ ওসাকা যাওয়া হলো না।



চিয়ন্-ইন্ মন্দির

এখানেই চিয়ন্-ইন্ মন্দিরটী তাঁর সঙ্গে দেখ্তে যাওয়া স্থির হলো। লাঞ্চ খেয়ে আমরা বেরুলাম। খানিকক্ষণ পার্কে বেড়িয়ে তারপর চিয়ন্-ইন্ মন্দিরের ভিতরটী দেখ্তে গেলাম। মন্দির দেখ্তে দর্শনী লাগে। যা পয়সা লাগ্ল মিঃ সিবাতা দিলেন, আমাদের দিতে দিলেন না। এরা মন্দির কি করে রাখ্তে হয় তা জানে। তাই যারা মন্দির দেখ্তে আসে তাদের কাছে পয়সা আদায় করে এবং সেই পয়সা দিয়ে সমস্তটি এমন পরিস্কার রাখে। লাভ করবার জন্যে দর্শনী আদায় করে না। মন্দিরে যাবার আগেই রাস্তায় একটি প্রকাণ্ড বড় ঘণ্টা আছে; দড়ি ধরে টেনে সেটী বাজাতে হয়। মন্দিরের ভিতরটী অতি সুন্দর এবং সুন্দর করে

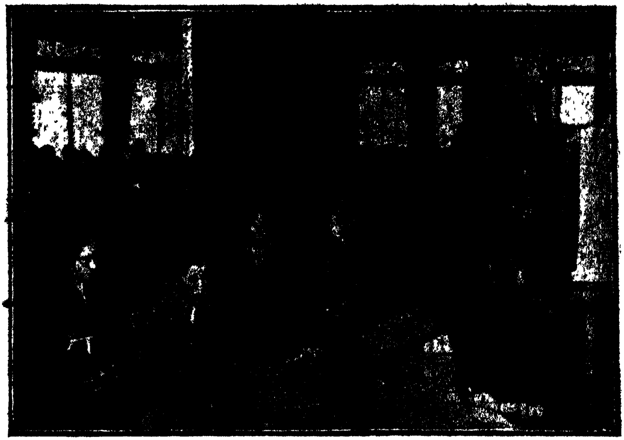
সাজিয়ে রেখেছে। আমাদের দেশের মন্দিরগুলিকে ভাল করে যত্নে রাখা হয় না; সে জন্য অনেক সুন্দর ও মূল্যবান মন্দির ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। এদের মন্দির মাত্রই কাঠের তৈরি; তবু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাতে কত সুন্দর দেখায়। এ সব মন্দির আমাদের মন্দিরের কাছে হার মানে বটে কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এ গুলিরই



চিয়ন্-ইন্ মন্দিরের ঘণ্টা

মন্দিরের চারদিকে কাঠের মস্ত বারান্দা আছে। ভিতরের দেয়ালে অনেক রকমের ছবি আঁকা আছে। ঘরের ভিতরের মেজে মাদুরে ঢাকা। আমরা জুতো খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। এ দেশের লোকে মোজার উপর এক রকমের কাপড়ের জুতো পরে। মন্দিরে ঢুকবার পূর্বে সেই কাপড়ের জুতো দর্শকদের বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। মন্দির দেখা হয়ে গেলে দর্শকেরা সেই জুতো ফিরিয়ে দেয়। আমরা কাপড়ের জুতো পরে সব ঘরগুলি দেখলাম। মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি ঘর আছে। একটা

বড় ঘরে বুদ্ধের মূর্ত্তি রয়েছে। অন্য ঘরে দেয়ালে নানা রকমের জাপানি ছবি আছে। বুদ্ধের মূর্ত্তির সম্মুখে একটি পিতলের পদ্মফুল রাখা হয়েছে এবং তাহারি ঠিক উপরে বড় বড় পিতলের ঝাড় ঝুল্‌ছে। এ গুলির কারুকার্য্য অতি সুন্দর। সমস্ত মন্দিরটী ঘুরে বেড়িয়ে দেখ্‌তে একটা ঘণ্টা লাগল। মন্দিরের ভিতর দিকে যে উঠানের মত আছে, তাতে সুন্দর বাগান করে রেখেছে। মন্দিরের ঘরটীতে প্রাচীনকালের রাণীরা এসে থাকৃতেন, সেটি আজও আছে। সেই ঘরের দিকে যাবার রাস্তাও কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। তার উপর মানুষ চল্‌লে কিচ্‌মিচ্‌ আওয়াজ হয়। মিঃ সিবাতা বল্‌লেন, এ রকমটী ইচ্ছা পূর্ব্বকই করা



বুদ্ধ মন্দিরে পুরোহিত ও উপাসকবর্গ

হয়েছিল। কেউ ঘরের দিকে আস্‌ছে কিনা রাণী ঐ শব্দ শুনে জান্‌তে পার্‌তেন। জাপানিদের ধর্ম্মটা বোঝা শক্ত! মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধের মূর্ত্তি

আছে বটে কিন্তু অন্য নানা রকমের ছবিও আছে। আমাদের দেশের মত এরাও মানত্ ইত্যাদি করে, কারণ অনেক জায়গায় কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছে দেখা গেল। যারা তীর্থ বা পূজা করতে আসে তারা বুদ্ধের সম্মুখে পয়সা দেয়, তারপর প্রার্থনা আওড়ায় এবং আমাদের দেশের মত মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। মন্দির দেখে আমরা হোটেলে



মরুয়ামা পার্কের কিয়দংশ

[illegible] ও মিঃ সিবাতা চা খেয়ে ফিরে গেলেন—রবিবার দিন তাঁর বোনকে নিয়ে আস্‌বেন বল্‌লেন। সে দিন এক সঙ্গে নারায় যাওয়া হবে স্থির হলো।

মরুয়ামা পার্ক

সন্ধ্যার সময় আমরা মরুয়ামা পার্কে গিয়ে বস্‌লাম। পার্কটা অতি সুন্দর। মাঝে মাঝে জল আছে, তাতে অনেক বড় বড় লাল মাছ আছে; অনেক জায়গায় ফুলের গাছও আছে। সমস্ত পার্কটী অসমতল; সেজন্য দেখ্‌তে খুবই সুন্দর। পার্কে অনেক জাপানী মেয়ে ও পুরুষ বেড়াতে আসে। এদেশে একটি বড় ভাল প্রথা দেখ্‌লাম। অনেক স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাদের মাষ্টাররা পার্কেতে বেড়াতে আসেন। এতে ছেলেদের শিক্ষায় সঙ্গে শরীর সুস্থ ও সবল হয়। প্রায় প্রতিদিনই এই রকম ত্রিশ চল্লিশটী ছেলে মেয়ে নিয়ে মাষ্টারদের নানা স্কুল থেকে আস্‌তে দেখা যায়। জাপানিরা আমাদের মতো ছেলেমেয়েদের বাড়ির মধ্যে বন্ধ করে বসিয়ে বই পড়ায় না। চোখ দিয়ে দেখে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে যাতে প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে, তার উপায় রাখে। চোখের সাম্‌নে দেখিয়ে ও কাজ করিয়ে যে শিক্ষা হয়, তা কখনই হাজার বই মুখস্থ করিয়ে হয় না। জাপানিরা শিক্ষার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেছে বলেই এদের এত সহজে শিক্ষা বিস্তার হয়েছে।

২৬শে মে—

আজ সকালে আমার স্বামী কিয়োটোর গভার্ণারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আমাদের দেশের কলেক্টরের মত কর্ম্মচারীকে এখানে গভার্ণার বলে। উনি সাড়ে বারটায় ফিরে এসে বল্লেন যে গভার্ণারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, এখানে যা দেখ্‌বার আছে তা দেখাতে তিনি আমাদের সাহায্য কর্‌বেন। তাঁর নিজের ইণ্টারপ্রেটারকে আমাদের সব দেখাবার জন্য নিযুক্ত করে দিয়েছেন। সে লোকটী

বিকেলে এসে প্রোগ্রাম ঠিক কর্‌বে। সেদিন রাস্তায় যে দুটি জাপানী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তারা আজ বিকেলে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো। তারপর গভার্ণারের ইন্টারপ্রেটার ও একজন স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টার এসে আমাদের কিয়োটোর দ্রষ্টব্যের একটা প্রোগ্রাম্‌ ঠিক করলেন। তাঁদের চা দিলাম। কাল সকালে হয় নিজে নয় তাঁর একজন বন্ধু এসে আমাদের মেয়েদের দোসিসা হাই স্কুল দেখাতে নিয়ে যাবেন স্থির হলো। আমাদের সহযাত্রী এমেরিকেন্‌ মিশনারির স্ত্রী মিসেস্‌ ড্রেস্লারও বিকেলে এলেন। তিনি কাল টোকিও যাবেন।

সন্ধ্যার সময় আমাদের হোটেলের পিছনে যে পাহাড় আছে সেটার উপর খানিকটা উঠ্‌লুম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বেশ প্রশস্ত রাস্তা আছে; মাঝে মাঝে বস্‌বার জায়গা রয়েছে। এদেশে পাহাড়ের উপর এত জঙ্গল আছে, কিন্তু একটা বুনো জন্তু নাই। জঙ্গলের মধ্যে বেশ স্বচ্ছন্দে বেড়ান যায়। পাহাড়ের উপর রাস্তার পাশে কোন কোন জায়গায় গোরস্থান আছে। পাহাড়টা খুব উঁচু বলে আমরা পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত উঠ্‌লাম না। নেমে এসে পার্কে একটু ঘুরে বেড়ালাম। এক জায়গায় দুটো জাপানি মাতাল গান কর্‌তে কর্‌তে আসছে দেখে আমার যে কি ভয় হলো, তা আর বল্‌বার নয়। পার্কের এ জায়গাটাতে লোক জন নাই; অতি নির্জ্জন। মাতাল দুটোকে দেখে আমি ভয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। আমার স্বামী সঙ্গে ছিলেন বটে; কিন্তু মাতাল দেখলে আমি জ্ঞানহারা হয়ে পড়ি। উনি থাকা সত্ত্বেও ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপ্‌ছিল। এর আগে মাতাল দেখে আমি এত ভয় কখনও পাই নাই। জাপানিরা বড় মদ খায়। সে জন্য আমার এখানে একা বেড়াতে সত্যিই বড় ভয় হয়।

দোসিসা স্কুল

২৭শে মে—

আজ সকালে গভার্ণারের লোক আমাদের দোসিসা স্কুল দেখাবার জন্য এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে পার্কের মধ্যে দিয়ে ট্রামের লাইনের কাছে গেলাম—পার্কের বাইরেই ট্রাম পাওয়া যায়। ট্রাম করে দোসিসা স্কুলে গেলাম। দোসিসা স্কুলটা এমেরিকান মিশন বালিকা বিদ্যালয়। বাড়ি ও হাতা দেখ্‌লে নতুন বলেই মনে হয়। হাতার মধ্যে অনেকগুলো বাড়ি আছে, বাগান ও টেনিস্‌-কোর্টও আছে। মিস্‌ মেট্‌সুদা বলে একজন জাপানি শিক্ষয়িত্রী আমাদের সব ক্লাশ দেখালেন। ইনি ইংরিজি জানেন। প্রথমে কলেজ, তারপর স্কুল দেখালেন। মিশন স্কুল বলে এটা একটু বেশী বিলাতি ধরণের হয়ে গেছে। কোবের হাই স্কুলের মত অমন বিশুদ্ধ জাপানি প্রতিষ্ঠান নয়। সেজন্য মেয়েদের আদব কায়দায় কেমন বিনয় ও নম্রতার অভাব মনে হলো। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণে অনেক দেখ্‌বার আছে।

Domestic Scienceএর (গৃহস্থালী শিক্ষার) ক্লাসটা বড় সুন্দর। এ ক্লাসে কি প্রণালীতে রান্না করতে হয় তারপর কেমন করে পরিবেশন করতে হয়, এবং সুগৃহিণী হবার আদব কায়দা কি, তা সকলি শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি ঘরের মধ্যে উনুন আছে, জলের কল আছে, রান্না শিক্ষার জন্য যা যা দরকার সবই আছে। তারপর খাবার ঘরের পরিবেশন ইত্যাদির আদব কায়দা শিখাবার জন্য রীতিমত সাজসজ্জাও আছে। সমস্তই হাতে কলমে দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। শুধু বই পড়িয়ে নয়।

আমাদের দেশের বালিকা-স্কুলে এ জিনিষটিরই অভাব ; কিন্তু এটিই খুব বেশি রকমে তুচ্ছ বলে মনে করা হয়। আমরা যদি সুগৃহিণী হতে চাই তা হলে আমাদের স্কুলে স্কুলে জাপানের মতো এরকম ক্লাস করা দরকার।

যা হোক তারপর যে ক্লাসটীতে আমরা গেলাম সেটী সেলাইয়ের ক্লাস। সেখানেও কাপড় কেটে কলে সেলাই করিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কাপড় কেমন করে কেটে সেলাই করে, সেটী একটা কালো বোর্ডে এঁকে দেখানো হয়েছে—সব মেয়েরা তাই দেখে সেলাই করছে। অন্য ক্লাসে কেমন করে কাপড় ধুতে হয়, কাঁজি দিতে হয়, কোন্ কোন্ কাপড়ে কেমন করে কাঁজি দিতে হয় ও রং করার পরে কেমন করে ইস্ত্রী কর্‌তে হয়, এ সমস্ত বিস্তারিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। নানা রকম রং ও কাঁজি ক্লাসেই আছে।

তারপর আমরা আরও দুতিনটি ক্লাস দেখ্‌লাম এবং মেয়েদের বোর্ডিংটীও দেখে নিলাম। বোর্ডিংটী সম্পূর্ণ জাপানি ধরণের ; খাবার ঘরে কিন্তু চেয়ার টেবিল আছে। বাগানে গিয়ে দেখ্‌লাম কেমন করে গাছ রোপন কর্‌তে হয় ইত্যাদি সেখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। একজন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত থেকে এই সব শিক্ষা দিচ্ছেন। এ স্কুলে ছয় শত বালিকা আছে ; তার মধ্যে দুই শত মেয়ে বোর্ডার। কোবেতে এবং এখানে দুজায়গাতেই দেখ্‌লাম, এ দেশে আর শিক্ষয়িত্রীর অভাব নাই। তা ছাড়া শিক্ষয়িত্রীরা যে যে বিষয় শিক্ষা দেয় সেই বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা। এদের শিক্ষয়িত্রীরা কত বেতন পায় সে কথা জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম যে পঞ্চাশ ইয়েনের কম বেতনে এখানে শিক্ষক নাই। এই জন্য এত উৎকৃষ্ট শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায়। এরা বালিকাদের শিক্ষার মূল্য অনুভব করেছে বলেই এর জন্য পয়সা খরচ কর্‌তে দ্বিধা করে না।

ওসাকারে হোটেল থেকে চার মাইল দূরে আমার স্বামী একটী কৃষি-

বিদ্যালয় দেখ্‌তে গেলেন—সেটা কিয়োটো সহরের বাইরে। গভার্ণারের ইণ্টারপ্রেটার ওঁর সঙ্গে মোটর করে সব দেখাতে গেলেন। উনি বল্লেন, সেখানে গিয়ে পৌঁছেই তাঁরা ওঁকে জাপানি চা খাওয়ালেন। তারপর স্কুল, কৃষিক্ষেত্র ও বোটানিকেল বাগান দেখালেন, পরিশেষে সেখানে তাঁরা ওঁকে আপনাদের বাগান থেকে খুব ভাল ষ্ট্রবারী ফল খাওয়ালেন। বিকাল পাঁচটায় উনি ফিরে এলেন।

শিল্প-বিদ্যালয়

২৮ মে—

আজ সকালে আমরা গভার্ণারের ইন্‌টারপ্রেটারের সঙ্গে কিয়োটো ইম্‌পিরিয়েল উচ্চ শিল্পবিদ্যালয় (Kyoto Imperial Higher Industrial School) দেখ্‌তে গেলুম। প্রথমে ট্রামে যেতে হলো, তারপর খানিক্‌টা হেঁটে গেলাম। এখানে জাপানি ছেলেরা নক্‌সা (design) কর্‌তে শেখে। কেমিকেল্‌ রং করা, কাপড়ে ষ্টেন্‌সিল্‌ (Stencil) করা, কলের ও হাতের তাঁতে বোনাও শিখান হয়। এ সব দেখ্‌তে খুবই মনোজ্ঞ, দেখ্‌লে অনেক শিক্ষা লাভ হয়। আমাদের দেশে এ রকম স্কুল কি একটাও আছে? স্কুলটা প্রথমে দেখ্‌বার আগে যে লোকটি আমাদের দেখাচ্ছিলেন তিনি আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে চা দিলেন এবং এখানে যে রেশমের কাপড় তৈরি হয় তাই কিছু দেখালেন। কাপড় ভাল, কিন্তু এরা বড় বহরের কাপড় তৈরি করে না। স্কুলটা দেখে আমরা এখানকার একটা বড় দোকানে গেলাম, সেখানে রেশমের জিনিষ পত্র বিক্রি হয়। অনেক কাপড় আছে, কিন্তু বড় দুর্ম্মূল্য। এখানে জাপানি ধরণের রেশমে বোনা ছবিও দেখ্‌লাম কিন্তু তার এক এক খানির দাম ১০০ ইয়েন। মনের মত জিনিষ এখানে পেলাম না।

ট্রামে হোটেলে ফেরা গেল। এ দেশের ট্রামগুলোতে অত্যন্ত ভিড় হয়; অনেক সময় বস্‌বার জায়গাও পাওয়া যায় না, দাঁড়িয়ে থাকৃতে হয়। এদেশে পুরুষরা মেয়েদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় না, তবে অনেক সময় আমার জন্যে জাপানিরা জায়গা ছেড়ে দিত। ইহাতে বিদেশীকে সম্মান

করবার অভিপ্রায় বোধ হয় ছিল। আমরা এ পর্য্যন্ত গকল জায়গাতেই জাপানিদের কাছে খুব ভাল ব্যবহার পেয়েছি।

বিকেলে থিয়েটার ষ্ট্রীট বলে একটা রাস্তা আছে সেটা দেখ্‌তে গেলাম। সেখানে অনেক দোকান আছে। তবে এই সব দোকানে প্রায় সব খেলো ঝুটো জিনিষ বিক্রি হয়। জাপানি মেয়েদের মাথায় পর্‌বার অনেক রকম ঝুটো গহনা ও চিরুণীতে এখানকার দোকান ভরা। জাপানি স্ত্রীলোকেরা চুলের খুব বাহার করে, সে জন্য মাথার খোঁপায় নানা রকমের ঝুটো গহনা লাগায়।

জাপানের রাস্তাগুলো কিন্তু ভয়ানক খারাপ। যাতে রাস্তার ধুলো ঘরের মধ্যে বা দোকানের মধ্যে না আসে সে জন্য এরা একটা বড় সুন্দর উপায় অবলম্বন করেছে। এরা প্রত্যেক বাড়ির সাম্‌নে বা দোকানের সাম্‌নে মধ্যে মধ্যে বাল্‌তি হাতে নিয়ে একটা বড় কাঠের হাতা দিয়ে জল ছিটিয়ে দেয়, তাতে ধুলো উড়্‌তে পায় না। রাস্তায় সারি সারি বাড়ি থাক্‌লে ঐ ভাবে অনেক্‌টা রাস্তায় জল দেওয়া হয়ে যায়; এতে যে কেবল দোকানদার ও বাড়িওয়ালাদের সুবিধা হয়, তা নয়—পথিকেরাও ধুলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। এদের মধ্যে একতা আছে বলে এ কাজটা সহজে হয়। এই উপায়ে রাস্তায় জল দেওয়াতে ধুলো হয় না বটে কিন্তু ভয়ানক কাদা হয়। শুনেছি মিউনিসিপেলিটী রাস্তায় জল দেয় না বা পরিস্কার করে না। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার জন্য মিউনিসিপেলিটী রাশি রাশি টাকা খরচ কর্‌তে একটুও দ্বিধা বা কার্পণ্য করে না।

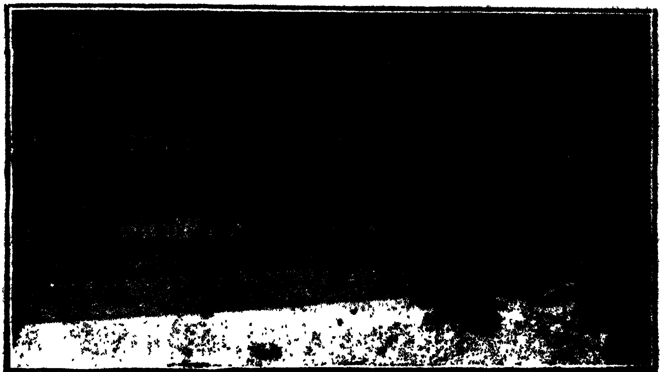
প্রাইমেরি স্কুল

২৯ মে—

আজ গভার্ণারের ইণ্টারপ্রেটারের সঙ্গে এখানকার একটা প্রাথমিক স্কুল দেখ্তে গেলাম। আমাদের দেশের একটা হাই স্কুলেরও বোধ হয় এত বড় ঘর বাড়ি নাই। আমরা প্রথমে স্কুলের হলে গিয়ে বস্লাম। ঘরটা বেশ বড়; সমস্ত ঘরটার মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকা। মাঝ খানে একটা লম্বা টেবিল্ ও তার চারদিকে কতকগুলো চেয়ার আছে। টেবিল্টার উপর স্কুলের ছেলেমেয়েদের তৈরি কাঠের ও অন্য নানারকমের জিনিস রয়েছে। আমরা প্রথমে এসেই এই বড় টেবিল্টার কাছে চেয়ারে বসেছিলাম। একটা চাকর এসে আমাদের অন্য একটা টেবিলের কাছে গিয়ে বস্তে অনুরোধ কর্লে।

তারপর এই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল্ এলেন। লোকটি ইংরাজি জানেন না, কিন্তু তিনি আমাদের খুব যত্ন কর্লেন এবং প্রথমেই আমাদের এক পেয়ালা করে জাপানি চা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হলো। জাপানিদের এই চা দিয়ে অভ্যর্থনাটা অনেক জায়গায় দেখ্লাম; আমাদের দেশের পান ও তামাক দেওয়ার মত। জাপানি চা আমাদের কাছে মোটেই সুস্বাদু বলে মনে হয় না। এদেশের লোকে সবুজ চায়ের গুঁড়ো গরম জলে ভিজিয়ে জলটা পান করে, তাতে দুধ চিনি দেয় না। এদের চায়ের বাটিগুলো ধরবার জন্য কোন হাতল্ নাই, এমনিই গোল সাদা ধরণের বাটি। চা এত পাতলা করে তৈরী করা হয় যে, খেলে মনে হয় যেন গরম জল খাওয়া যাচ্ছে। সে জন্য জাপানিরা দিনের মধ্যে অনেকবার এই চা পান করে।

চা পান সমাপ্ত হলে প্রিন্সিপ্যাল্ আমাদের স্কুলটা দেখাতে নিয়ে গেলেন। প্রথমে যে ঘরটায় গেলাম সেটায় অনেক রকমের মডেল আছে। সেই মডেলগুলি দেখিয়ে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। নানা রকমের



প্রাইমেরি স্কুল গৃহের কিয়দংশ

পাখী ইত্যাদিও এখানে ছেলেমেয়েদের চেনাবার জন্য রাখা হয়েছে। যেমন মিউজিয়ামে রাখা হয়, মরা পাখীদের ঠিক সেই রকমে ষ্টফ্ করে রাখা হয়েছে। বল্‌তে গেলে এটা স্কুলেরই একটা মিউজিয়াম। ছেলে মেয়েরা যখন তখন এই ঘরে এসে জিনিসগুলি দেখ্‌তে পারে, তা ছাড়া শিক্ষকরা সব বুঝিয়ে দেন। যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যে এসব জিনিসকে আলমারিতে বন্ধ করে রাখা হয়।

দ্বিতীয় ক্লাসটি গানের। সেখানে একজন শিক্ষক পিয়োনো বাজিয়ে ছেলেদের গলার সুর দুরস্ত করছেন দেখা গেল। প্রথমে আমাদের "সা, রে, গা, মা" যেমন করে সাধে তেমনি এরা "ডো, রে, মি" ইত্যাদি

সাধ ছিল। বাজ্‌নার সঙ্গে যেখানে গলার সুরের অমিল হচ্ছিল সেখানটা আবার বাজিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এদের শিক্ষকেরা খুব যত্ন সহকারে শিক্ষা দেয়। পরে অঙ্কের ক্লাস ও হাতের লেখার ক্লাস দেখ্‌লাম। সাদা কাগজে তুলির দ্বারা, কলমের দ্বারা নয়,-খুব বড় বড় করে অক্ষর লেখানো হচ্ছে। যখন লেখে তখন মনে হয় ছবি আঁকছে! এই রকম তুলি দিয়ে হাতের লেখা শিক্ষা করায় ওদের ছবি আঁকাতেও নিপুণতা হয়। ছেলে মেয়েরা যে রকম একাগ্রচিত্তে বসে লেখাপড়া শিক্ষা করছে তা দেখ্‌লে সত্যিই বড় তৃপ্তি বোধ হয়। এসব বিদ্যালয় দেখ্‌লে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির অভাব মনে পড়ে যায়। স্কুলটি দেখে এসে আমরা আবার সেই "হলে" এসে বস্‌লাম। প্রিন্সিপাল আমাদের আবার এক পেয়ালা করে চা দিলেন এবং আমাদের তিন জনকে ছেলে মেয়েদের তৈরী তিনটী জিনিষ উপহারও দিলেন। লোক্‌টী অতি ভদ্র; কিন্তু ইংরিজি ভাষা মোটেই জানেন না। আমাদের দেশে ইংরাজি ভাষা জানা না থাকলে কোনো লোক শিক্ষিত বলেই ধর্ত্তব্য নয়, কিন্তু এ দেশে তা নয়। বাইরে ছেলেমেয়েরা খেলা কর্‌ছে দেখ্‌লাম। এ স্কুলটীতে ২৩ জন শিক্ষক আছে; ছেলেমেয়ে সব শুদ্ধ ৫৫০টী। এক স্কুলে পড়্‌লেও ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ঘর আছে; মেয়ে ছেলে এক ঘরে বসে পড়ে না। মেয়ের ও ছেলের ক্লাশও আলাদা হয়। মেয়েদের প্রায় সব ক্লাসে শিক্ষয়িত্রীরা পড়ান, তবে কোন কোন বিষয়ে মেয়েদের ক্লাসেও পুরুষ শিক্ষক আছেন দেখ্‌লাম। এ দেশে ছয় বৎসর থেকে বার বৎসর পর্য্যন্ত ছেলে মেয়েদের স্কুলে দিতেই হয়, এটা বাধ্যতা-মূলক (compulsory)। এ স্কুলটীতে এই জেলার যে ছেলেমেয়ে পড়ে তাদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য জেলার ছেলে মেয়েরা অল্প কি দিতে বাধ্য। মিউনিসিপ্যালিটি

এখানে প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্য করে। আমাদের দেশের মেয়েরা মায়ের সাহায্য করবার অছিলায় স্কুলে আসতে পারে না। এতে আমাদের দেশে মেয়েদের অনেক সময় অশিক্ষিতা থাকতে হয়। এ দেশে কিন্তু সে স্বার্থপরতা নাই। এদেরও মায়েরা গৃহের কাজ কর্মে মেয়েদের সাহায্য পাওয়াটায় অভাব অনুভব করেন নিশ্চয়; তবে তাঁরা কন্যাদের পরকালের কথা ভেবে সেটা সহ্য করে যান্। শিক্ষা জিনিষটার মূল্য জাপানিরা বেশ উপলব্ধি করেছে। আমরা যদি আজ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অভাব উপলব্ধি করতাম তা হলে এ দেশের এই হীনতা, এই দরিদ্রতা থাকত না। পঞ্চাশ বৎসর আগে যাকে লোকে অসভ্য বলেই জানতো, সেই জাপান শিক্ষার জোরে আজ এত উন্নত; আর আমরা অতীতের সব কীর্ত্তি সব কাহিনী ভুলে গিয়ে শিক্ষার অভাবে এত পশ্চাৎপদ ও পরাধীন। এক শিক্ষার অভাবে আমাদের সব অতীত গৌরব লোপ পেয়েছে। জাপানকে দেখ্‌লে মনে হয় শিক্ষা পেলে আমরাও একদিন আমাদের অতীত গৌরব ফিরে পাবার আশা করতে পারবো। জাপান শিক্ষার অভাবে পঞ্চাশ বৎসর আগে আমাদের মতই হীন ও অজ্ঞান ছিল। আমাদের দেশের পিতামাতারা জেগে উঠুন—পুত্র কন্যাদের শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, তা হলে দেশের অভাব ঘুচ্‌বে। শিক্ষার জন্য এরা কত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছে। আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাসে চারি আনা মাত্র বাপ মায়েদের কাছ হতে কষ্টে পাওয়া যায়; ঐ চার আনা দেবার ভয়ে কন্যা চিরদিন অজ্ঞান ও অশিক্ষিত থাকে। অনেক পিতামাতা মাসে এই সামান্য খরচ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বলেন;— "মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে কি হবে, সে কি চাকুরি করবে?" আমাদের দেশে শিক্ষা শুধু চাকুরি পাবার আশায় দেওয়া হয়, জ্ঞান লাভের আশায় নয়। সেই খানেই হলো আমাদের গলদ্। যত দিন শিক্ষার মর্য্যাদা আমরা না বুঝ্‌ব ততদিন আমাদের এই হীন পরাধীন অবস্থায় থাকতে হবে!

স্কুলের বাড়ি ঘর জাপানিরা যে রকম করেছে আমাদের দেশের স্কুলগুলি তার তুলনায় গোয়াল-ঘর মাত্র। এই সব স্কুল দেখে মনে হচ্ছে দেশে ফিরে গিয়ে কোন রকমে এই রকম সুন্দর বড় বড় স্কুল করে, দেশের ছেলে মেয়েদের এই রকম শিক্ষা দিয়ে, দেশকে এদের মত স্বাধীন করি। কিন্তু হায় এ সব দুরাশা মাত্র!

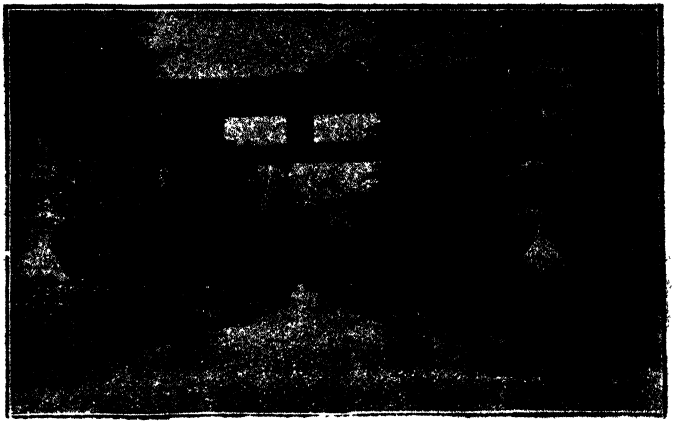
জাপানে সুন্দর সুন্দর ব্রঞ্জের (bronze) ও পিতলের জিনিষ পাওয়া যায়। মিঃ কাঁগাওয়া কিয়োটোতে একটা ভাল দোকানে আমাদের কথা বলে দিয়েছিলেন; সেই দোকানের একজন লোক আমাদের তাদের দোকানে নেবার জন্য এলো। ব্যবসা কেমন করে চালাতে হয় এরা তা বেশ বুঝেছে! আমরা বলেছিলাম দু চার দিন পরে যাব, কিন্তু আজ বিকেলেই সে এসে তার দোকানে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌ল। আমরা তখন বেড়াতে বেরুচ্ছি, সে জন্য তাকে বলা হলো আমাদের সঙ্গে আস্‌তে। আমরা প্রথমে "টি-পট" (teapot) লেন্ হয়ে কিয়োমিট্‌সু মন্দিরটা দেখে তার পর ওর দোকানে যাব। আমাদের দেশে হলে দোকানি বলে দিত "না বাবু, আমার সময় নেই; তোমাদের সঙ্গে ঘুরে মন্দির দেখাতে আমার সময় নেই!" জাপানিরা পাকা ব্যবসাদার; সে লোকটা বিনা আপত্তিতে খুব আহ্লাদের সহিত আমাদের Yasaka Pagoda (ইয়াসক্ পেগোডা) ও কিওমিট্‌সু মন্দির দেখাতে সঙ্গে যাবে বল্লে। মন্দির দেখা হলে তার দোকানে গিয়ে জিনিষ দেখা হবে স্থির হলো। আমরা বেরিয়ে প্রথম ইয়াসক্ পেগোডাটা দেখ্‌লাম। ভিতরে যেতে দেয় না, বাইরে থেকেই দেখ্‌লাম। বাইরে থেকে মামুলি চীনে পেগোডা যেমন ছবিতে দেখা যায় এটাও তেম্‌নি। জাপানিদের মন্দির বা পেগোডাগুলো একটু এক-ঘেয়ে। একটা দেখ্‌লে অন্যগুলো দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না। এগুলোর গঠন-প্রণালী একই ধাঁজের। যা হোক্, এই

পেগোডার পাশ

পাহাড়ের উপরেই

ক্রমশঃ উঁচুতে উঠে গেছে

ইত্যাদি জিনিষের দোকান দেখ্‌তে একটা জিনিষ কিন্‌লাম। নিচে থেকে উপর পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তাটার দুধারে চিনে মাটির জিনিষ; তাই এ রাস্তাটাকে teapot (চাদানি) লেন্‌ বলে। অবশেষে মন্দিরের উপর আসা গেল। মন্দিরটাতে কোন বিশেষত্ব নাই,



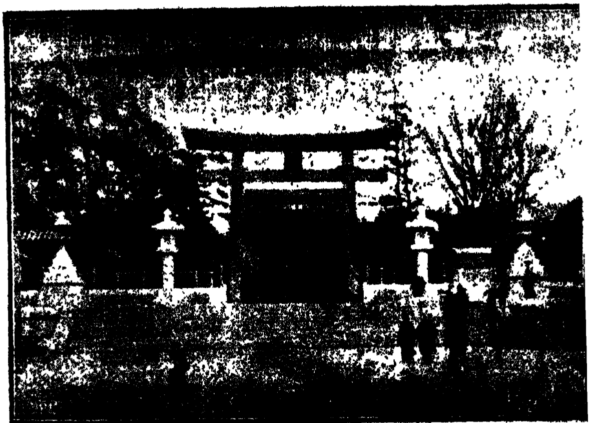
শিন্তোমন্দিরের ফটক ("তোরি")

তবে পাহাড়ের উপরের দৃশ্যটা অতি চমৎকার। চারিদিকে পাহাড়; তার উপর বড় বড় পাইন্‌, চেরি ও মেপেল্‌ গাছ; গাছের পাতার নানা রঙ্গে পাহাড়গুলো বড় চমৎকার দেখাচ্ছে। আগেই বলেছি জাপানিরা তাদের মন্দিরগুলিকে খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, কিন্তু এদের স্থপতি-বিদ্যাটা তেমন সুন্দর নয়। আগে জাপানিরা মন্দিরের ছাতগুলোকে গাছের বাকল দিয়ে ছাইত, কিন্তু এখন সব ছাউনিই প্রায় শ্লেটের রঙ্গের টাইল

খাওয়া ত দূরের কথা, তার কাছে দাঁড়ান কষ্টকর হয়। জাপানি দোকানদাররা কিন্তু কখনও তাদের খাদ্য দ্রব্য খুলে রাখে না, সে যত ছোট দোকান্ হোক্ না কেন। সব রকমের খাবার দ্রব্য তারা কাঁচের কেসের মধ্যে রাখে। এটাও সুশিক্ষার গুণ!

অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে আমরা ইসিয়ামা মন্দিরে গেলাম, মন্দিরটা একটা ছোট পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের নিচে থেকে মন্দির পর্য্যন্ত সিঁড়ি আছে। উপর থেকে দৃশ্যটা অতি চমৎকার। মন্দিরটার কিছু বিশেষত্ব নাই। সব মন্দিরই এক ধাঁজের গড়া। দেখ্‌লাম অনেক জাপানি মেয়ে-পুরুষ সেখানে পূজা করতে এসেছে। মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধের প্রতিমা আছে, তার সম্মুখে পয়সা রাখ্‌বার একটা জায়গা আছে। সেখানে যাত্রীরা পয়সা ফেলে দিচ্ছে, তারপর নমস্কার করছে। বেশীর ভাগ যাত্রী স্ত্রীলোক; কিন্তু পুরুষও আছে। কোন কোন জায়গায় যাত্রীরা দড়ি টেনে মন্দিরের ঘণ্টা বাজায়। এই রকম অনেক পদ্ধতিতে পূজা করা হয়। দেখ্‌লাম স্কুলের ছেলেমেয়েরা দলে দলে তাদের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। শিক্ষা পাচ্ছে—নির্ম্মল বায়ু উপভোগ করছে। সুন্দর দৃশ্য দেখে তাদের প্রাণে সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌ছে,—এই জন্যই তো জাপানিরা চিত্রকলার এত রসজ্ঞ। কই আমাদের অভাগা দেশে এমন শিক্ষা কজন ছেলেমেয়ে পায়? সেই ছোট ছোট গোয়াল ঘরের মত বদ্ধ গৃহমধ্যে তারা বই মুখস্থ করে যা শিক্ষা পায়। সে কি আবার শিক্ষা! সব স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদের এক একটা ইউনিফরম্ Uniform (এক প্রকারের পোষাক) পরতে হয়। তারা সেই পোষাক পোরে বেড়াতে আসে বলে তাদের সহজেই চেনা যায়। স্কুলের ছেলেরা প্রায় সকলেই আমাদের দেশের ট্রাম বা রেল-ড্রাইভারের মত কাপড় ও টুপি পরে। কোনো কোনো স্কুলে ছেলেদের স্কার্টের মত

কাপড় এবং তার সঙ্গে টুপি পর্তে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা কোট্ প্যান্টলুনই পরে, তবে তাদের টুপি গোল না হয়ে চৌক ধরণের। শীতের সময় প্রায় কাল কাপড়ের এবং গরমের সময় সাদা কিংবা কাল-সাদা ডোরা ইউনিফরম্ ব্যবহার করা হয়। স্কুলের মেয়েরা কিমোনোর



শিন্তো মন্দিরের ফটক ও পাথরের লণ্ঠন

উপর একটা করে হয় লাল, নয় গাঢ় নীল রঙের স্কার্ট পরে। শুধু কিমোনো পরে চলা ফেরা কর্তে অসুবিধা হয়, সে জন্য ওরা এই স্কার্টের আবিষ্কার করেছে। স্কুলের মেয়েদের চুল প্রায় খোলা থাকে, নয় বিলাতী ফেসানে ফিতা দিয়ে বাঁধা থাকে। তারা কখনই জাপানি ধরণে চুল বাঁধে না, তা ছাড়া "ওবি"টাও পিছনে পরে না।

মন্দির দেখে এসে আমরা হ্রদের ধারে বাগানে একটি বেঞ্চের উপর বস্‌লাম। সেখান থেকে জাপানি মেয়েপুরুষদের বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখ্তে লাগ্‌লাম ও হ্রদের সৌন্দর্য্যও উপভোগ কর্তে লাগ্‌লাম।

অনেক মেয়ে পুরুষ হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে ছিপ্ দিয়ে মাছ ধর্‌ছে। কেউ বা বাগানে যে "টি-হাউস্" (চা-ঘর) আছে সেখানে বসে গল্প গুজব কর্‌ছে ও চা খাচ্ছে। অবশেষে সেই বাজারের ভিতর দিয়ে গিয়ে ঘাটে গেলাম। সেখানে টিকেট্ কিনে আর একটা লঞ্চে চড়্‌লাম। এ লঞ্চ্‌টা ঠিক আগের লঞ্চের মত। এবার আমরা নীচের কেবিনে প্রথমে গিয়ে বস্‌লাম। সেখানে গিয়েই দেখি একটি জাপানি স্কুলের মেয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবে সকলের সম্মুখে মুখে রং মাখ্‌ছে। রং মাখাটা এরা কিছু খারাপ ভাবে না, তাই লুকিয়ে মাখে না। আমাদের কাছে রং-মাখা মুখ বড় খারাপ লাগে। এরা মুখে এত রং মাখে যে মুখে অনেক ব্রণ ফোঁড়া ইত্যাদি হয়ে পড়ে; তাতে মুখের সৌন্দর্য্য বড় নষ্ট হয়। জাপানি মেয়ে দেখ্‌তে সুন্দরী নয়, তার উপরে সারা মুখে ব্রণের দাগ হলে কেমন দেখায় তা সহজেই অনুমান করা যায়! জাপানি মেয়েদের মধ্যে আমাদের মাপ কাঠির সুন্দরী একটাও দেখি নাই। দো-আস্‌লা জাপানি মেয়েদের মধ্যে অনেক বেশ সুন্দরী দেখেছি। জাপানীদের আর একটা দোষ, তাদের দাঁত। ওদের মধ্যে দাঁত পরিষ্কার করার প্রথা বোধ হয় নাই; তাই দাঁতগুলো ভয়ানক নোংরা দেখায়। ছোট ছেলে মেয়েদেরও দাঁত ভয়ানক ময়লা ও কুশ্রী। সে জন্য জাপানি মেয়ে পুরুষদের মধ্যে দাঁত বাঁধান, বিশেষতঃ সোণার দাঁত খুবই প্রচলিত। সোণার দাঁত কিন্তু আমাদের চোখে বড় কুৎসিৎ মনে হয়।

নিচের কেবিনে হাওয়ার অভাবে আমরা একটু পরেই উপরে "ডেকে" গিয়ে বস্‌লাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা আবার ওৎসুতে এসে পড়্‌লাম। সকলের আগে আসায় ট্রামে এবার বস্‌বার জায়গা পেলাম। কিন্তু পরে যারা এল তাদের দাঁড়িয়ে যেতে হলো!

মধ্য বালিকা-বিদ্যালয়

৩১শে মে—

আজ সকালে আমরা মিঃ সাইতানীকে (গভার্ণারের ইণ্টারপ্রেটার) নিয়ে একটা মেয়েদের middle স্কুল (2nd Girls School) দেখ্‌তে গেলুম। এ স্কুলের বাড়িটাও খুব প্রকাণ্ড। এখানেও প্রিন্সিপ্যাল আমাদের একটা ঘরে বসিয়ে জাপানি চা খাওয়ালেন। তারপর সমস্ত স্কুলটা সঙ্গে করে দেখালেন। এ স্কুলে আট শত ছাত্রী আছে। প্রথমে মেয়েরা ড্রিল করছে দেখ্‌লাম। আগে যে দুটী বালিকাদের হাই স্কুল দেখেছিলাম এখানেও সেই রকম সুন্দর ভাবে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষয়িত্রী ড্রিল শেখাচ্ছেন। এখানে মেয়ে পুরুষে চল্লিশটী শিক্ষক আছেন। এ স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার খুব বিশেষ বন্দোবস্ত আছে দেখ্‌লাম। সাবান তৈরি করার প্রণালী আজ মেয়েরা ক্লাসে ছোট ছোট টিউবে করে শিখ্‌ছে। ড্রইং ক্লাসে প্রত্যেক মেয়ে এক একটী কাঁচের পাত্রের জলে জিয়ন্ত সোণালী মাছ রেখে আঁক্‌ছে। জিয়ন্ত মাছ নড়্‌ছে, এটা আঁকা খুবই কঠিন! প্রত্যেক ক্লাসে মাষ্টারের সামনে একটী টেবিলে ফুলদানিতে ফুল সাজান আছে। স্কুলে বিজ্ঞানের দু-তিনটী বড় বড় লেবরেটারী আছে। গান শিক্ষার ক্লাসও আমরা দেখ্‌লাম। জাপানি শিক্ষয়িত্রী পঞ্চাশটী মেয়েকে দাঁড় করিয়ে বাজ্‌নার সঙ্গে জাপানি গান ইংরাজি সুরে অভ্যাস করাচ্ছেন। আগেই বলেছি, জাপানিরা তাঁদের কথার সঙ্গে বিলাতি সুর দিয়ে স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। প্রত্যেক ক্লাসে একটী ছোট আল্‌মারিতে ক্লাসের মেয়েদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক সকল রাখা হয়েছে—

একটি "রেফারেন্স্"-রুম আছে; সেখানে মেয়েরা গিয়ে ডিক্‌স্‌নারির (অভিধানের) সাহায্যে পড়া জেনে নিচ্ছে। এ স্কুলেও শিষ্টাচার শেখাবার জন্য ক্লাস আছে। সর্ব্বশেষে আমরা মেয়েদের বাস-গৃহগুলি দেখ্‌লাম। শোবার ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে খাট বিছানা নাই, শুধু একটা করে জলচৌকি ধরণের নিচু টেবিল আছে। প্রত্যেক ঘরে নানা রকমের ফুল সুন্দর করে সাজান আছে। কোন কোন ঘরে কাঁচের পাত্রে লাল মাছ রাখা হয়েছে। জাপানিরা লাল মাছ পুষ্‌তে খুব ভালবাসে। তাদের দেশে খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাল মাছ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাগানে জলের মধ্যে সব জায়গায় বড় বড় লাল মাছ পুষে রাখে। ওজনে ১ সের ১॥০ সের আন্দাজের লাল মাছ জাপানে সর্ব্বদাই দেখা যায়। এরা সুন্দর জিনিষের খুব আদর জানে। মেয়েদের স্নানের ও মুখ হাত ধোবার ঘরও দেখা গেল, সে ঘরগুলিও পরিষ্কার। এখানে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের (natural history) একটা মিউজিয়ম আছে। মেয়েদের বছর বছর কেমন উন্নতি হয়েছে তাই দেখ্‌বার জন্য তাদের প্রথম বৎসর স্কুলে আসার সময়কার ও তার পর পর বৎসরের আঁকা ছবি দেয়ালে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কোবে বালিকা স্কুলের মত এখানেও মেয়েরা নিজেরা সব স্কুল ঘর ইত্যাদি নিজে পরিষ্কার করে। মেয়েদের ডর্মিটারীর (শোবার ঘরের) সঙ্গে এখানে হাসপাতালও আছে। জাপানে ব্যায়ামের উপর কতদূর মনোযোগ দিয়েছে তা প্রত্যেক স্কুলের ব্যায়ামাগার দেখ্‌লে বোঝা যায়। জাপানে প্রায় বৃষ্টি হয়, সে জন্যে বাহিরে ব্যায়াম করা সব সময় হতে পারে না; তাই প্রাইমেরি স্কুল থেকে আরম্ভ করে হাই স্কুল পর্য্যন্ত সব জায়গায় ছাদওয়ালা ব্যায়ামাগার আছে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব

স্কুলটি দেখে আমরা ইম্পিরিয়াল্ মিউজিয়াম্ দেখ্‌তে গেলাম, তার জন্য টিকেট্ কিন্‌তে হলো। এখানে খুব বেশী পুরাতন জিনিষ নাই। কিছু কিছু ঐতিহাসিক ও পুরাতন বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূর্ত্তি, ছবি ও হাতে লেখা পুঁথি ইত্যাদি আছে; পুরাতন শিল্প সম্বন্ধীয় জিনিষও কিছু আছে। এই সব জিনিষগুলির মধ্যে অনেকগুলি হচ্ছে national treasure (জাতীয় সম্পদ)। মিউজিয়ামটী বেশ সুন্দর ভাবে সাজান রয়েছে। এ সব দেখ্‌লে বোঝা যায় যে, জাপানের সভ্যতার উপর বুদ্ধের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের কত দূর প্রভাব। কি ভাস্কর্য্য, কি চিত্রাঙ্কণ সবই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে। মনে হয় যেন প্রাচীন জাপানের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বুদ্ধের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য থেকেই ফুটে উঠেছে। আর এই সৌন্দর্য্যগুলিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে তোল্‌বার জন্যে জাপানের প্রাচীন শিল্পীদের মনে যে কি গম্ভীর আবেগ ছিল তা এগুলি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। জাপানের বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে সোজা না এসে চীন দেশ হয়ে এলেও ভারতবর্ষের সঙ্গে তার নিকট সম্বন্ধ সহজে ধরা পড়ে; জাপানীরা প্রধান আধ্যাত্মিক ভাবগুলি যে ভারতবর্ষ থেকে খুব নিকট ভাবেই পেয়েছে তাও বেশ বোঝা যায়। National treasure (জাতীয় সম্পদ),—এর মধ্যে বুদ্ধের মা মায়াদেবী ও তাঁর তিনটী দাসীর মূর্ত্তি রয়েছে। প্রত্যেক চিত্রে প্রায়ই পদ্মের ও বজ্রের ছবি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। একটা প্রকাণ্ড ছবি দেখ্‌লাম যাতে খালি অনেকগুলি বজ্র ও পদ্ম সারি সারি আঁকা আছে। দাইগোজি মন্দির থেকে কয়েকটী ছবি এখানে অল্পদিনের মধ্যে সাধারণকে দেখাবার

জন্যে রাখা হয়েছে। তাতে হংস-বাহন ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি অতি পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে আঁকা আছে। বৃষভ-বাহন শিবের অনেক ছবি এই মিউজিয়ামে দেখা গেল। প্রাচীন জাপানে গরু বাছুর ছিল না, সুতরাং এই শিবের মূর্ত্তির কল্পনা যে সোজা ভারতবর্ষ থেকে ধার করা সে সম্বন্ধে কোন ভুলই হতে পারে না। কোন কোন চিত্রে ও লেখায় দেবনাগরী অক্ষর রয়েছে। একখানি বড় চিত্র রয়েছে যাতে মাঝখানে বুদ্ধের ছবি ও চারিদিকে অতি সুন্দর ভাবে আঁকা ভারতবর্ষের জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বাদশ রাশি, অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনের ছবি আঁকা রয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরা যে জাপানে এসেছিলেন এবং তাঁদের উপরে যে এখানকার লোকের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তার একটা অতি আশ্চর্য্য ও চূড়ান্ত নিদর্শন এই মিউজিয়ামে দেখা গেল। সেটা হচ্ছে এক জোড়া খড়ম। কোনো ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রচারক যে খড়ম ব্যবহার করেছিলেন তা অতি যত্নে এখানে রাখা হয়েছে! শ্রদ্ধার চূড়ান্ত নিদর্শন নয় কি?



জিউজিৎসু ও তলওয়ার খেলা

জাপানে "জিউজিৎসু" ব্যায়াম একটা দেখবার জিনিষ শোনা গেছে। এর শিক্ষার জন্য স্কুলও আছে। আমার স্বামী ও ছেলে সেই স্কুল দেখ্‌তে



জিউজিৎসু

গেলেন। আমাদের ধারণা ছিল আমাদের দেশের কুস্তিওয়ালাদের মত জাপানীরা "জিউজিৎসু" করবার সময় শুধু নেংটী পরে, সে জন্য আমি

গেলাম না। আমার স্বামী সেখান থেকে ফিরে এসে আমাকে না নিয়ে যাওয়ায় অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। সেখানে যা দেখ্লেন তা আমি তাঁর কাছে শুনে এখানে লিখ্ছি। স্কুলের হাতার ভিতর ঢুকে ওঁরা প্রথমে অনেক জাপানি পুরুষ তলওয়ার খেলছে দেখ্লেন—যাকে ইংরাজিতে Fencing বলে। তারপর ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখ্লেন একটা বড় ঘরের এক দিকে "জিউজিৎসু" ও অন্য দিকে Fencing শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ওঁরা ঘরের এক পাশে কয়েকখানি চৌকি ছিল তাতে গিয়ে বস্লেন। জিউজিৎসুর দ্বারা অনেক ছোট ছেলে বয়স্কদের চিৎ করে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। Fencingটাও খুব সুন্দর হচ্ছিল। দুজন করে প্রায় ১০।১২ জোড়া লোক আলাদা আলাদা Fencing করছিল। প্রত্যেক জোড়া লোক Fencing আরম্ভ করবার আগে হাঁটু গেড়ে পরস্পরকে সেলাম করে। খেলোয়াড়দের বিশেষ সাজসজ্জা আছে; খেলার সময়ে তারা মুখে লোহার জালের মুখোস এবং মাথায় ও শরীরে বর্ম্ম পরে।

খেলার প্রথমে লাঠি দিয়ে এক জন অন্য জনকে খুব জোরে মারতে চেষ্টা কর্ছিল। কিছুক্ষণ পরে Fencing খেলার ওস্তাদ নিজে বর্ম্ম পরে এসে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগ্লেন। তিনি এমন কায়দা করে লড়্তে লাগ্লেন যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ওরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁর গায়ে লাঠি ঠেকাতে পার্ল না। Fencing খেলাতে প্রত্যেক খেলোয়াড় প্রত্যেক ঘা মার্বার সঙ্গে সঙ্গে জোরে হুঙ্কার ছাড়ে।

আমার স্বামী যেখানে বসে খেলা দেখ্ছিলেন সেখানে দুজন ভারতীয় পুরুষ ও একটী মহিলা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ওঁর আলাপ হলো। এক-জনের নাম রায় বাহাদুর লালা সুলতান সিং; মহিলাটি তাঁরই স্ত্রী। অন্যটী ওঁদের বন্ধু; তাঁর নাম মিঃ পেয়ারীলাল। তাঁরা দিল্লি থেকে এখানে

বেড়াতে এসেছেন এবং কিয়োটো হোটেলে আছেন। ওঁরা জিউজিৎসু হল থেকে কিয়োটো হলে গেলেন। সেটা একটা প্রকাণ্ড হল্। সেখানে এ সহরের বড় বড় মিটিং হয়। হল্‌টা খুব সুন্দর—নূতন তৈরি হয়েছে—দেওয়ালগুলোতে কাগজের পরিবর্তে কিয়োটোর রেশমের সূচি কার্য্য (embroidery) করা। ৬টার সময় রায় বাহাদুর লালা সুলতান সিং



তলওয়ার খেলা

সস্ত্রীক এবং তাঁহার বন্ধু আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ওঁদের সঙ্গে নানা গল্প হলো। ওঁরা চীন দেশ দেখে এখানে এসেছেন; এমেরিকা হয়ে বিলাত যাবেন। তাঁদের খুব আলাপী লোক বলে মনে হলো কিন্তু ওঁরা কালই ইয়োকোহামা চলে যাবেন। তাই এক সপ্তাহ পরে আমরা

টোকিও গেলে সেখানে ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে আশা করে রইলাম। ওঁরা কিয়োটো হোটেলে থাকেন বটে, কিন্তু মিসেস্ সিং টেবিলে খান্ না। তিনি নিজের চাকর সঙ্গে এনেছেন; সে আলাদা রান্না করে দেয়। মিঃ সিং টেবিলে খান বটে কিন্তু মাছ মাংস খান না—ওঁরা জৈন। এ হোটেলটা ওঁদের খুবই ভাল লেগেছে।

মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়

১লা জুন—

আজ সকালে আমরা একটা ছেলেদের Middle English School (মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়) দেখ্‌তে গেলাম। মিঃ ময়তানি আমাদের সঙ্গে সব জায়গায় স্কুল ইত্যাদি দেখাতে যান, আজও এলেন। ট্রাম থেকে নেমে এক মাইল হেঁটে আমরা স্কুলে পৌঁছলাম। রাস্তায় একটা মন্দিরের ভিতর দিয়ে যেতে হলো। সেখানে ঐ স্কুলের কয়েকটা ছেলে বন্দুক নিয়ে



মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়

মিলিটারি ড্রিল কর্‌তে যাচ্ছিল দেখ্‌লাম। আজ ১লা জুন, সে জন্য সব স্কুলের ছেলেরা সাদা কাপড় পরতে আরম্ভ করেছে। এখানে সব কাজেই একতা দেখা যায়,—কাপড় পরার রীতিতেও একতা। ১লা জুন থেকে

আরম্ভ করে দুমাস গরম হয়, সে জন্য ঐ সময়টা সরকারের আদেশ অনুসারে সমস্ত জাপানি ছেলে সাদা কাপড় পরে। একতার কি আশ্চর্য্য গুণ! স্কুলে পৌঁছবার পূর্ব্বে যে রাস্তা দিয়ে যেতে হলো সেটা ভয়ানক বিশ্রী। জাপানের রাস্তাগুলো অত্যন্ত খারাপ ও অপরিষ্কার। ঐ রাস্তার ধারে জায়গায় জায়গায় পচা জলওয়ালা ডোবা আছে। রাস্তার ধারে ড্রেনগুলিও পরিষ্কার করা হয়নি; ভয়ানক ময়লা ও পচা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ঠাণ্ডা দেশ বলে সব সয়; আমাদের দেশ হলে এ রাস্তার লোকদের টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি রোগাক্রান্ত হতে বেশী সময় লাগ্‌ত না! রাস্তায় যেতে যেতে দোকানে পচা মুলো দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এ জিনিষটা জাপানীরা খুব পছন্দ করে—এতে কিন্তু ভয়ানক দুর্গন্ধ। মুলোগুলোকে মাটিতে পুঁতে রাখার পরে পচে হল্‌দে রং হলে সেগুলি এদের আহারের উপযোগী হয়। এই পচা মুলোই অনেক খাদ্যে সস্ (sauce) স্বরূপ ব্যবহার করা হয়।

আমরা middle স্কুলে এসে পৌঁছতেই সেখানকার প্রিন্সিপ্যাল্ আমাদের একটা ঘরে নিয়ে বসালেন ও ওঁদের দস্তুর মত জাপানি চা দিলেন। ভাল ইংরাজি বল্‌তে পারেন না, তবে তাঁর কথা বোধগম্য। ভদ্রলোকটী এ স্কুলে ২০।২২ বৎসর কাজ করছেন এবং তাঁর নিজের প্রণালীতে এ স্কুলে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমার সাড়ি দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়ে গেল। আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন আমার কাপড়টাকে কি বলে। আমার স্বামী বল্লেন আমাদের দেশের মহিলারা এই কাপড়কে "সাড়ি" বলেন। 'সাড়ি' কথাটী তিনি লিখে নিলেন। তারপর সাড়ি কত বড় হয়, কেমন করে পর্‌তে হয়, সব খুব আগ্রহের সঙ্গে জান্‌তে চাইলেন; আমার স্বামী তাঁকে সব বুঝিয়ে বল্‌লেন। শুনে তাঁর অত্যন্ত আনন্দ হলো। তার পরে আমাদের তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বাড়িটা স্কুলের হাতারই মধ্যে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হলো; কিন্তু তিনি এক কথা ইংরাজি বলতে বা বুঝতে পারেন না। প্রিন্সিপ্যালকে মধ্যস্থ করে কথা বলতে হলো। তাঁর স্ত্রীকে আমার পরিচ্ছদের বিষয় সব বুঝিয়ে দিলেন—তাঁরা আশ্চর্য্য হয়ে আমার পরিচ্ছদ দেখলেন। এঁদের ঘরে পুরা জাপানি ধরণের সাজ সজ্জা নাই; টেবিল চেয়ারও আছে, সে জন্য ঘরদোর জাপানিদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। এ লোকটার মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাব আছে, তাই বোধ হয় পুরো জাপানি পরিচ্ছন্নতার অভাব দেখা গেল। যা হোক্ তাঁরা আমাদের খুব যত্ন করলেন। তাঁদের বাগানে নিয়ে গিয়ে আমাদের জন্য ফুল তুলে ফুলের তোড়া তৈরি করে দিলেন। বাগানে খুব Sweet Pea ও Poppy ফুল ফুটে আছে। তারপর আমরা স্কুল দেখতে গেলাম। ৯৫০টী ছাত্র এ স্কুলে আছে। বাড়িটা খুব বড় কিন্তু আমরা যে সব বালিকা বিদ্যালয় দেখেছি তার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। স্কুলটার চার দিকে কেমন বিশৃঙ্খলতার ভাব দেখা গেল। প্রিন্সিপ্যাল নিজে ডর্মিটারীর (শোবার ঘরের) তদারক করেন ও ছেলেদের চরিত্রের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন; অথচ আমাদের মনে হলো এ স্কুলের ছেলেদের মধ্যে ভাল আদব কায়দা শিখান হয় নি। তার কারণ বোধ হয় প্রিন্সিপ্যাল ছেলেদের ইচ্ছা মত কাজ করতে দেওয়ায় বিশ্বাস করেন; সে জন্য স্কুলে তেমন ডিসিপ্লিন্ (নিয়ম-রক্ষা) হয় না। মেয়েদের স্কুলের মতই ক্লাসে পড়ান হয়, তবে ঘরগুলি তেমন ভাল ও পরিষ্কার নয়। এখানে ১২ বৎসর থেকে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলে পড়ে। আমরা সমস্ত ঘুরে ক্লাসগুলো দেখলাম। এখানকার ছেলেদের বাসগৃহগুলি মোটেই পরিষ্কার নয়। সেখানে প্রিন্সিপ্যালের নিজের বাড়ীর মত সব জিনিষ পত্র বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান রয়েছে দেখলাম। মেয়েদের স্কুলের সব বাসঘরগুলিতে দেখেছি, বিছানা কাপড় তুলে দেয়ালে যে আলমারি

আছে তারি মধ্যে রাখা হয়, কিন্তু এখানে সবই বাইরে ছড়ান পড়ে আছে। খাবার ঘরে ছেলেরা টেবিল্ চেয়ারে বসে টিফিন্ খাচ্ছে। খাদ্য কিন্তু জাপানি ভাত ইত্যাদি। শুধু বোর্ডার ও মাষ্টাররাই খাচ্ছেন। খাবার ঘরের দেয়ালে একটা বোর্ডে জাপানি ভাষায় লেখা আছে "আমরা কাজ করবার জন্য খাই, খাবার জন্য কাজ করি না"। এঁদের ক্লাস ঘরেও এই রকম একটা না একটা ভাল উপদেশ লেখা থাকে। কিন্তু একটার বেশী উপদেশ কোনো ঘরেই দেখা গেল না। বোধ করি উপদেশটাকে ঘরের ছাত্র-ছাত্রীর মনে গেঁথে দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা। মেয়েদের একটা স্কুলের ঘরে লেখা ছিল "faithfulness to parents" অর্থাৎ পিতা মাতার উপরে আনুগত্য। এ স্কুলটা দেখে বোঝা গেল জাপানের সব স্কুল সমান নয়; তবে ওরা সব স্কুলকেই ভাল করবার চেষ্টায় আছে। দেখ্লাম বাইরে থেকে যে ছেলেরা পড়তে এসেছে, তারা সঙ্গে ভাত ইত্যাদি বাক্সের মধ্যে করে এনে তাই বাগানে বসে খাচ্ছে। এরা খাবার সময়ে বাক্সটা হাতে রাখে ও চপষ্টিক্ দিয়ে খায়। স্কুল দেখা সমাপ্ত হলে প্রিন্সিপ্যাল আমাদের আবার চা খাওয়ালেন এবং তারপর আমরা বিদায় হলাম।

গ্রাম্য স্কুল

২রা জুন—

পর দিন সকালে আমার স্বামী ৬।৭ মাইল দূরে একটা গ্রামে গিয়ে ছুটো কৃষি-সমিতি ও একটা প্রাথমিক গ্রাম্য স্কুল দেখ্‌লেন। সেখানকার গ্রাম্য-স্কুল এখানকার প্রাথমিক স্কুলেরই মতন। প্রায় ছয়শত ছেলেমেয়ে পড়ে, তাদের স্কুলেও মিউজিয়াম আছে। খেলার জায়গাটা মস্ত; ব্যায়ামাগারও খুব প্রশস্ত ঘরে আছে। স্কুলে কুড়ি-পঁচিশটা বড় বড় ক্লাসের ঘর আছে। এখানে যত স্কুল আছে সেখানে হাতের লেখার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। এখানের স্কুলের সব চেয়ে ছোট মাষ্টারের বেতন ৪০ ইয়েন্‌ অর্থাৎ প্রায় ৫০্‌ টাকা। সেই জন্য ভাল শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আট দশ টাকায় আর কত ভাল শিক্ষক পেতে আমরা আশা করি? তাই যেমন বেতন তেমনি শিক্ষক ও তার উপযুক্ত শিক্ষাও মেলে। সে জন্যই আমাদের দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলির এত দুরবস্থা!

এখানকার গ্রাম্য স্কুলে ছেলেমেয়েরা এক ঘরে বসে বটে কিন্তু একটা ডেস্কে যে দুটী চেয়ার থাকে তার একটীতে মেয়ে ও অন্যটীতে ছেলে বসে না। হয় দুটীই মেয়ে, নয় দুটীই ছেলে বসে। ছেলে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক্ ক্লাস-ঘর নাই। এখানকার প্রাথমিক স্কুলেই শুধু এই ব্যবস্থা। এ স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছেলেরা ছেলেদের ও মেয়েরা মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি হয়। সব ক্লাসেই ছেলেমেয়েদের জন্য ডেস্ক ও বেঞ্চ আছে। এ দেশের লোকে উপযুক্ত বেতন দেয়, সে জন্য কাজও ভাল হয়।

এখানকার রাস্তায় যে কনেষ্টবল পাহারা দেয়, তাদের বেতন পঞ্চাশ টাকা। তাদের হাতে একটা করে তলওয়ারও থাকে। বিকেলে চায়ের

পরে পার্কে গিয়ে বসে জাপানিদের চলাফেরা দেখ্‌ছিলাম। আগেই বলেছি তারা আমাদের দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে যায়, বিশেষতঃ আমার পরিচ্ছদ তাদের কাছে নূতন লাগে, সে জন্য আমাদের দেখ্‌লেই তারা চেয়ে থাকে। জাপান দেশটাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সেরা জায়গা বল্‌লে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তা'ছাড়া জাপানিদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান আছে বলে, তারা গাছ পালাকে বড় হতে দেয় না এবং সেগুলাকে সুন্দরভাবে বাগানে সাজিয়ে রাখে। জাপানের বাড়ি-ঘরের ছবি দেখ্‌তে যত সুন্দর, আসলে কিন্তু তত সুন্দর নয়। জাপানে বাড়ি-ঘর ও বাজার যে সব জায়গায় থাকে সেগুলি বরং বিশ্রীই দেখায়। বাড়ির ছাতগুলো প্রায় ছাই রঙ্গের শ্লেটের বা খোলার তৈরি—সে জন্য দেখ্‌তে বড় কুৎসিত।

কিয়োটোর পার্ক ও মন্দির

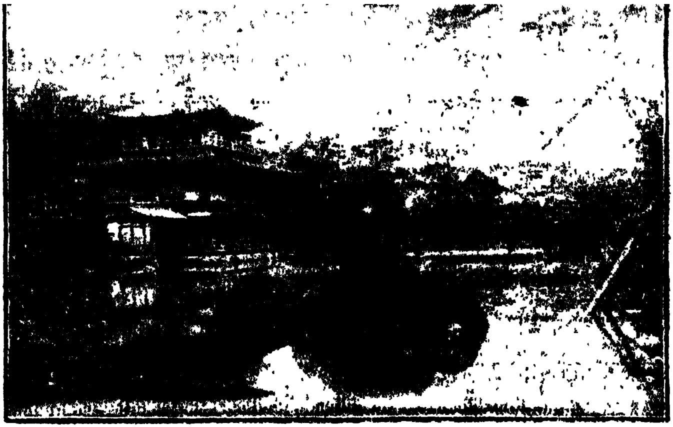
নানা পার্কের মধ্যে মরুয়ামা পার্কটী অতি সুন্দর। পার্কের ভিতরে ছোট ছোট খাল আছে, তাতে অনেক বড় বড় লাল মাছ পুষে রেখেছে। ছোট ছেলেমেয়েরা এখানে এসে খালের ধারে দাঁড়িয়ে মাছগুলোকে খেতে দেয় ও দেখে কিন্তু কখনও ধরবার চেষ্টা করে না। সমস্ত পার্কটা অসমতল এবং চারিদিকে ফুলের গাছে ভরা। সকালে বিকেলে কিয়োটোর শত শত লোক এখানে সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌তে আসে। দুপুরেও লোকে ভরা থাকে; অনেক লোক চড়িভাত কর্‌তেও এখানে আসে। আমাদের হোটেলটা পার্কের এত কাছে হয়ে বড় সুবিধা হয়েছে। যখন ইচ্ছা আমরা সেখানে গিয়ে বস্‌তে পারি।

৩রা জুন—

মেঘ হওয়া ও বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকা সত্বেও আমরা আজ এখানকার দু'একটা মন্দির দেখ্‌বার সঙ্কল্প করলাম। "কিং-কাকুজি" বলে একটা মন্দির আছে সেটা প্রথমে দেখ্‌তে গেলাম। সেখানে যাবার অর্দ্ধেক রাস্তায় মোটর বাস্ আছে; ট্রাম থেকে নেবে আমরা সেই বাসে করে কিং-কাকুজিতে গেলাম। মাইল দুই বাসে যেতে হল। মন্দির দেখ্‌বার জন্য টিকিট লাগে। কিং-কাকুজির মধ্যে দু তিনটে মন্দির আছে। প্রথম একটা হ্রদের ধারে। হ্রদটা অতি সুন্দর; তার মধ্যে দেড় হাত লম্বা লাল মাছ রয়েছে দেখা গেল—খেতে দিলে কাছে এসে খায়। এই মন্দিরটার তিন দিকেই হ্রদ; এক দিকে শুধু ডাঙ্গা আছে। এক সময় এটা একজন বড় লোকের বাস-ভবন (Villa) ছিল। তাই পুরো

জাপানি ধরণে তৈরি। কাঠের তৈরি, কিন্তু তিনটা তলা আছে। এর চারদিকে আবার কাঠের বারাণ্ডা। নিচের তলায় একটা বড় ঘর আছে; এখন তাতে তিনটা মূর্ত্তি রয়েছে। মূর্ত্তিগুলি কাপড়ে ঢাকা ছিল। যে ভদ্রলোক এ বাড়িটা তৈরি করেছিলেন, এ মূর্ত্তিগুলি তাঁরি। মাঝের তলায় আমরা একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। সেখানে বুদ্ধের একটা বড় মূর্ত্তি দেখা গেল। এ ঘরটারও চারদিকে কাঠের বারাণ্ডা আছে। সব উপরের ঘরটা নিচের ঘরগুলির মতই, তবে তাতে কিছু নাই। ঘরের ছাতটা সোণালী গিল্টি করা; সেজন্য এ বাড়িটার নাম কিংকাকুজি অর্থাৎ "গোল্ডেন্ পেভিলিয়ান্ টেম্পেল্" (Golden Pavilion Temple)। যা' হক্ যত নাম শুনেছিলাম মন্দিরটাকে তত সুন্দর বোধ হল না। তবে মন্দিরের বাগানের ও হ্রদের দৃশ্য সত্যই মনোহর। বাগানে একটা প্রস্রবণ আছে; সেখানের জলে পূর্ব্বের গৃহস্বামীর চা তৈরি হতো। এখানের পুরোহিতের বাড়ি বাগানের মধ্যেই। আমরা তারি পাশ দিয়ে গেলাম। পুরোহিত দাঁড়িয়ে জাপানি ভাষায় কতকগুলি জাপানি মেয়ে পুরুষের কাছে মন্ত্র পড়্ছিলেন। কথা বোঝা গেল না বটে, কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যেমন করে মন্ত্র আওড়ান ইনিও তেমনি স্বরে মন্ত্র পড়্ছিলেন। তারপর আমরা আর একটা মন্দির দেখ্লাম। এটাও কিংকাকুজির অন্তর্গত; এখানে বুদ্ধের মূর্ত্তি নাই। বাড়িটাতে অনেকগুলি ঘর আছে—ঘরের মেজেতে মাদুর পাতা আর কোন আসবাব-পত্র নাই। শুধু দেয়ালে অনেক পুরাতন ছবি আছে, ছবিগুলি নাকি খুবই পুরাতন। এই বাড়ির পিছন দিকে যে একটা পাইন গাছ আছে সেটা দেখ্বার যোগ্য। গাছটাকে এমনভাবে বেঁধে ঘুরিয়ে বড় করেছে যে, সেটা আকারে ঠিক একটা নৌকার মত হয়ে গেছে। এটা বড়ই আশ্চর্য্য জিনিষ। এত বড় একটা পাইন গাছকে কেমন করে

বেঁধে ডালগুলি যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে নিয়ে নৌকার আকার করে দিয়েছে তা' ভেবেই পাওয়া যায় না। গাছটির নাম land-boat tree অর্থাৎ "ডাঙ্গার নৌকা গাছ।"



কিংকাকুজি মন্দির

তারপর আমরা হোঙ্গান্‌জি মন্দির দেখতে গেলাম। এ মন্দিরটা দেখ্‌তে খুব বড়। ট্রাম থেকে নেমে একটা গলির মধ্যে ঢুকলাম; সে গলির দুধারে বাজার আছে, সেখানে মন্দিরের ব্যবহার-যোগ্য নানা রকমের জিনিষ ও বুদ্ধের ছবি বিক্রি হচ্ছে। আমার স্বামী একটা ছবি ও বুদ্ধের বিষয় জাপানিতে লেখা একটা কাগজ কিন্‌লেন। মন্দিরের ফটকে ঢুকে আমরা সম্মুখে গেলাম। সেখানে বাজে লোক কেউ ছিল না, শুধু যারা পূজা করতে এসেছে তারাই ছিল। গভর্ণরের প্রেরিত জাপানী গাইড্ মিঃ একাবুচি অনুমতি নিয়ে মন্দিরের পিছন দিকে আমাদের নিয়ে গেলেন। সেখানে পুরোহিত কয়জন ছিলেন তাঁরা

সৌন্দর্য্যে আমাদের মন্দির এদের কোন মন্দিরের কাছে হার মানে না। এ দেশের পুরোহিত শিক্ষিত, আমাদের দেশের পুরোহিত প্রায় অশিক্ষিত, তারা ভাল জিনিষের মর্য্যাদা কি বুঝবে? যা' হোক্ পুরোহিত অতি যত্নে আমাদের সব দেখালেন। আমার স্বামী বল্লেন, তোমরা আমাদের বুদ্ধকে সত্যই খুব সম্মান দেখাচ্ছ। কিন্তু বুদ্ধ যে গাছের (অর্থাৎ অশ্বত্থ গাছের) তলায় বসে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে গাছ তো কই তোমরা এ দেশে আন নাই। পুরোহিত বল্লেন সে গাছ এনে এদেশে পালন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা এ দেশে বাঁচে না। এই মন্দিরটাকে দেখ্‌বার পর আমরা বৌদ্ধ-কলেজের লাইব্রেরী দেখ্‌তে গেলাম। সেখানে অনেক পুরাতন বই আছে। প্রায় সবই জাপানি ভাষায় লিখিত। বৌদ্ধ কলেজটা শুধু বাইরে থেকে দেখ্‌লাম, বৃষ্টি হওয়ায় ভিতরে যাবার সুবিধা হল না। আমরা তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠে হোটেলে এলাম। বৌদ্ধ কলেজে যারা শিক্ষা করে প্রায় সবাই পুরোহিত হয়। হাই স্কুল থেকে এসে এই কলেজে প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর অধ্যয়ন করতে হয়। লাইব্রেরিটা দেখতে যাবার পূর্ব্বে হোঙ্গান্‌জি মন্দিরের বাগানটাও দেখ্‌লাম—যিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর চা খাবার ঘর ও অন্য থাক্‌বার ঘরগুলি দেখ্‌লাম। এ সব ঘর সবাই দেখ্‌তে পায় না। গভার্ণার বলে দিয়েছিলেন সে জন্য এঁরা সব দেখালেন। তা ছাড়া বুদ্ধ ভারতীয়, সে জন্য এঁরা ভারতবাসীদের উপর খুব সম্মান দেখান বলে মনে হলো।

জাপানি উৎসব

৪ঠা জুন—

আজ বড় বৃষ্টি হচ্ছিল, সে জন্য আমাদের ইচ্ছা মত নারা যাওয়া হলো না। একটা দোকানে ও ব্যাঙ্কে গেলাম। দোকানে কোন জিনিষ কেনা বড় মুস্কিল। জিনিষ পত্র দেখবার যো নাই, লোকগুলো আমাদের দেখে "হাঁ" করে চেয়ে থাকে—কি চাই না চাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যায়। আমি যদি সাড়ির উপর কোট পরি তা হলে অতটা তাকায় না, নতুবা কোন জনতার মাঝে যাওয়া বড়ই কষ্টকর, চার দিক থেকে লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে। কিন্তু এখানকার দোকানে জিনিষ পত্রের বড় বেশী দাম। আমরা যে জিনিষ চাই তা প্রায় পাওয়া যায় না। দোকানে জাপানিদের আবশ্যকীয় দ্রব্যই বেশীর ভাগ আছে। দোকান থেকে আমরা শিল্পাগার (Art Academy) দেখ্‌তে গেলাম। ট্রাম থেকে নেমে প্রায় আধ মাইল হাঁট্‌তে হলো। আর্ট একাডেমিটা তেমন সুন্দর নয়, তবে কতকগুলো বেশ সুন্দর ছবি এঁকেছে দেখা গেল। এখানে ছেলেরা বারো বৎসরের বয়স থেকে ভর্ত্তি হয়; তার মানে প্রাথমিক স্কুলে পড়ে এখানে আসে। ঘর দোর এখানে তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। জাপানিদের মধ্যে এটা সচরাচর প্রায়ই দেখা যায় না। ছেলেরা একটা ঘরে সত্যিকার ফুল সামনে রেখে আঁকছে। সেখানে ওদের এই কাজ দেখে বড় ভাল লাগ্‌লো। ব্রাস্‌ দিয়ে প্রথমে ফুল পাতা এঁকে নিচ্ছে, পরে তার উপর রং দিয়ে পেণ্ট্‌ করছে। এরা পেন্সিল ব্যবহার করে না। এখানে মেয়ে ছাত্র মোটেই নাই। আজ অনেকগুলি ক্লাস বন্ধ ছিল, সে

জন্য ক্লাস ঘরগুলি প্রায় খালি। ছবির লাইব্রেরীতে গেলাম। সেখানে কয়েকটা সুন্দর ছবি দেখ্‌লাম—সেগুলি জাপানি মেয়েদের ছবি। এক এক খানি নাকি দুই শত টাকায় বিক্রি হবে। এর পর Commercial Museum (পণ্য দ্রব্যের মিউজিয়ম) দেখ্‌তে গেলাম। অনেক রকমের জিনিষ আছে, যা এখানকার দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায় না। তবে বিশেষ কিছু সুন্দর জিনিষ দেখ্‌লাম না। অনেক বিদেশী জিনিষের নমুনা এখানে এনে সাজিয়ে রেখেছে। কলিকাতার পণ্য দ্রব্যের মিউজিয়মের চেয়ে অনেক ভাল জিনিষ আছে। তবে এদের মিউজিয়মটার বাড়ি আমাদের মিউজিয়মএর চেয়ে বড় ও বেশ সুন্দর। ইহা একটা বাগানের মধ্যে স্থাপিত।

৫ই জুন—

আজ সকালেও মেঘ করে আছে সেজন্য নারা যাওয়া উচিত হবে না মনে করে আমরা বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম না। ধীরে সুস্থে স্নানাদি সারা যাবে স্থির করলাম। ইতিমধ্যে হোটেলের কেরাণী (Book-Keeper) এসে বল্লে যে আজ তাদের একটা বড় পরব (festival) আছে, সেটা দেখ্‌বার জন্য হোটেলের প্রোপ্রায়টার (স্বত্বাধিকারী) তাঁর বাড়ি যেতে নিমন্ত্রণ করেছেন। সেখান থেকে মন্দিরে গিয়ে পরব দেখা যাবে। বৃষ্টি পড়ছিল, সেজন্য আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমার স্বামীর এ সব ব্যাপারে ভয়ানক উৎসাহ। তিনি বল্লেন রিক্‌শ করে গিয়ে ট্রাম ধরে সেখানে যাব, কষ্ট হবে না। তাই যাওয়া স্থির হলো। মিঃ একাবুচিও এসে যাবার জন্য তাগিদ দিতে লাগ্‌লেন। অবশেষে রিক্‌শ করে Electric ট্রেণের ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণে উঠ্‌লুম। অনেক লোক উৎসব দেখ্‌তে যাচ্ছে। যদিও বৃষ্টি পড়ছে তবু লোকের অভাব নাই। Electric ট্রেণগুলো ট্রামেরই মত ; তবে একটু বড়। ট্রেণ থেকে নেমে

একটু হেঁটে আমরা প্রোপ্রায়টারের বাড়ি এলাম। রাস্তায় একেবারে কাদা হয়ে গেছে। তাঁর বাড়ির উপরের একটা ঘরে গিয়ে বসা গেল। ঘরটা রাস্তার উপরেই, সেখান থেকে একটা প্রসেসন্ (procession) যাবে, তাই দেখ্‌বার জন্য আমাদের ঐ ঘরে বস্‌তে হ'ল। ঘরগুলো জাপানি ধরণের। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দুদিকে দুটো ঘর,—একটা সাম্‌নে অন্যটা পিছনে। সামনের ঘরে মাদুর ছাড়া কিছু নেই। ঘরের দুপাশে সব বিছানা গাদা করে রেখে সে গুলো এক একখানা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আমাদের জন্য সেই ঘরে চৌকি এনে দিলে ও জাপানি চাও দিলে। একটু পরে প্রোপ্রায়টার ও তাঁর ভাগ্‌নি হোটেল থেকে এলেন। এ ভাগ্‌নিটী হোটেলে সব দেখা শোনা করেন, এঁকে আমরা আগে দেখেছি। প্রোপ্রায়টার ও তাঁর ভাগ্‌নি আমরা আস্‌বার অল্প পরেই এলেন। তাঁদের সঙ্গে হোটেলের একজন ইংরেজ বোর্ডারও এলো। সে খুব জাপানি ভাষায় প্রোপ্রায়টারের ভাগ্‌নির সঙ্গে কথা-বল্‌ছিল। প্রসেসন্ ৯টায় যাবার কথা ছিল কিন্তু সাড়ে দশটাতেও গেল না। আমরা বসে বসে রাস্তার কাদা বৃষ্টি ও লোকজন দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। প্রোপ্রায়টারের ভাগ্‌নি অন্য ঘরে গিয়ে গ্রামোফোনে একটা জাপানি রেকর্ড বাজাতে লাগ্‌লেন। ইংরেজ লোকটা সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে গল্প আলাপ কর্‌তে লাগ্‌ল। ওরা যে রকম করে কথা বার্ত্তা কর্‌ছিল তাতে মনে হলো ওদের মধ্যে বেশ আলাপ আছে। প্রোপ্রায়টারের স্ত্রী নাই ; দু'টী ছোট মেয়ে আছে তারা ৯।১০ বৎসরের ও একটী ছেলে আছে। প্রোপ্রায়টারের স্ত্রী তিন বছর হ'ল মারা গেছেন। এই ভাগ্‌নিটীর বয়স বছর ২০।২২ হবে—সে আমাদের হোটেলেই থাকে। সেই সূত্রে তার এই ইংরেজটীর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা। এই ইংরেজ লোকটীর সঙ্গে আমার স্বামীর পূর্ব্বে কিছু আলাপ হয়েছিল ; সেই সময়ে সে জাপানি

মেয়ে পুরুষের চরিত্রের বিশেষ দোষ দিয়েছিল। ইতি মধ্যে বারোটা বেজে গেল তখনও প্রোসেসন্ এলো না। আমরা তখন লাঞ্চ্ খেলাম, জাপানি লাঞ্চ্ আমাদের উদরস্থ হলো না। তার কারণ আগেই বলেছি, সে জন্য আমাদের জন্য ওরা sandwich দিলে। মিঃ একাবুচি ও সেই ইংরেজটা রীতিমত জাপানি লাঞ্চ্ খেলে। আমার স্বামী ওদের সঙ্গে অল্প কিছু খেলেন। ওরা খাদ্যের সঙ্গে জাপানি সুরা "সাকি"ও পান করলে। সাকিটা এদেশের মেয়ে পুরুষ উভয়েই পান করে। মিঃ একাবুচিই বেশী সাকি খেলেন। ইংরেজটা বল্লে সাকি এক বোতলের বেশী খেলেও তার নেশা হয় না। কিন্তু মিঃ একাবুচি বল্লেন, এক বোতল খেলে তাঁর বেশ নেশা হয়। খাওয়া সমাপ্ত করে আমরা সাম্নের ঘরে যেতেই প্রোসেসন যাচ্ছে দেখ্লাম। প্রথমে অনেকগুলো লোক অনেক রকমের কাপড় ও মুখোস পরে গেল। তার পর ঘোড় দৌড় হ'ল। লোকগুলো কেউ ঘোড়ায় কেউ রিক্‌শতে গেল। তারা নানা রকমের মুখোস্ ও কাপড় পরেছিল। ঘোড়-দৌড়টা হলো কিন্তু রাস্তাতেই। রাস্তার খানিকটা খানিকটা এক সঙ্গে নিয়ে দুদিকে দুটো লোক দুটো নিশান নিয়ে দাঁড়াল এবং রাস্তার দুধার লম্বা দড়ি দিয়ে বন্ধ করে দিল, যাতে লোক বাড়ীর ভিতর থেকে রাস্তায় না আসে। তার পর ৫।৭টা ঘোড়া চড়ে ৫।৭টা লোক একটার পর আর একটা দৌড়ল। ঘোড়ার উপর ওদের পুরণ ধরণের জিন। রেকাবগুলো বড় মজার দেখ্তে। ঘোড়া যখন ছুটিয়ে দেয় তখন লোকটা একটা পা শূন্যে তুলে দেয় অন্যটা রেকাবে থাকে; কোন কোন লোক আবার দুটো পা উপরে তুলে দিয়ে খুব জোরে চিৎকার করে। সেই চিৎকারের শব্দে ঘোড়াটা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায়। একটা লোক আবার ঐ অবস্থায় থেকে একটা কাগজ তাকে দিলে সেই কাগজে ঘোড়ার কথাটা জাপানি ভাষায় লেখে। এই রকম তারা নানা কেরামত দেখালে।

প্রোসেসন্ চলে গেলে পর "God-box" অর্থাৎ দেবতাওয়ালা বাক্স আস্‌বে শোনা গেল। মিঃ একাবুচিই আমাদের সেই God-box দেখাবার জন্য এখানে আরও খানিকক্ষণ বস্‌তে বল্লেন—তিনিই যখন আমাদের



God-box (দেবতার বাক্স)

কাণ্ডারী তখন তাঁর কথায় আমরা বসে রইলাম। তিনি সাকি খেয়েছিলেন, তার নেশার চোটে তাঁর ঘুম পেয়ে গেল। তিনি আমায় বল্লেন "আমি সাকি প্রায়ই খাই না, তবে খেলে আমার বড় ঘুম পায়"। এই বলে চাদর-ঢাকা ঘরের পাশে যে বিছানা ছিল, তাই একটা টেনে নিয়ে

তাঁর ওভারকোট্‌টা পায়ের উপরে দিয়ে খুব ঘুমুতে লাগলেন। আমার ছেলের আর ধৈর্য্য রইল না ; অবশেষে অন্য ঘর থেকে একটা পিং পংএর খেলা এনে সে খেলা জুড়ে দিলে। আমরা সকলেই তাতে এক একবার যোগ দিলাম। মিঃ একাবুচিরও ঘুম ভাঙ্গলো ; কিন্তু God-boxএর প্রোসেসন্‌ আর এলো না। তখন প্রায় তিনটা ; সে জন্য স্থির হলো যে আমরা মন্দিরে গিয়ে ঐ ব্যাপারটা দেখ্‌ব। মন্দির থেকেই প্রোসেসন্‌ বেরুবার কথা। বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় অত্যন্ত কাদা ছিল সে জন্য আমার আর হেঁটে যেতে ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু এতদূর এসে God-boxগুলো না দেখে ফেরা ঠিক হবে না ভেবে গেলাম। মন্দিরে গিয়ে দেখা গেল, God-box সেখানে নাই। তখন মন্দির ছাড়িয়ে যেখানে God-box আছে সেখানে গেলাম। কিন্তু আবার বৃষ্টি এলো তবু কোন প্রকারে সেখানে যাওয়া হলো। এত কষ্টের পর সেখানে গিয়ে দেখি বৃষ্টির জন্য সে গুলি ঢেকে দিয়েছে। তিনটী God-box ছিল ; প্রথমটা একেবারে ঢাকা ছিল, দ্বিতীয়টী তখন ঢাকা হচ্ছিল, সমস্তটা ঢাকা হয় নাই তাই সেটা দেখা গেল। God-boxগুলো দেখবার মত জিনিষ বটে। কাঠের তৈরি সোণালী রঙের বাক্স—তাতে নানা রকমের মূর্ত্তি আছে। উপরে একটা বড় পাখি আছে। সমস্তটা সোণার বলে মনে হয়। বাক্সের দুধারে দুটো বাঁশ লাগান আছে সে গুলোর দ্বারা তুলে লোকে কাঁধে করে God-box ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমাদের রথ যেমন এদের God-box যেন অনেকটা সেই ধরণের। বাক্সগুলো বইতে ৪০।৫০ জন লোকের দরকার হয়। মন্দির থেকে লোক গুলো খুব সাকি খেতে পায়। তার পর তারা খুব উৎফুল্ল হয়ে এই God-boxটা কাঁধে নিয়ে খুব "হয়ত" "হয়ত," শব্দ করে লাফিয়ে বেড়ায়। এদের এ জন্য আর মজুরি দিতে হয় না। এটা এখানে একটা দেখবার জিনিস বটে। নিকটেই ইলেকট্রিক ট্রেনের ষ্টেসন

ছিল, আমরা সেখানে গেলাম। প্রোপ্রায়টার আমাদের জন্য টিকিটের দাম দিয়ে টিকিট কিনে আনলেন। কিন্তু ট্রেনে ভয়ানক ভিড় ছিল। সব লোক এই উৎসব দেখতে এসেছে ; দুটী ট্রেন একেবারে ভরা। সে জন্য ট্রেন দাঁড়ালো না, একেবারে চলে গেল। তৃতীয় ট্রেনটিও ভরা ছিল ; কিন্তু কোন প্রকারে ঢোকা গেল। বস্‌বার জায়গা ছিল না, কাজেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসা গেল।

নারা

৬ই জুন -

খুব ভোরে ওঠা গেল। আমরা শীঘ্র টোকিও যাব, সে জন্য আজ নারা জায়গাটা দেখতে যেতেই হবে স্থির করলাম। মিঃ একাবুচিকে নিয়ে ষ্টেসনে গেলাম। দিনটা ভাল হয়েছে, বেশ রোদ উঠেছে। আজ কাল প্রায়ই বৃষ্টি হয় সে জন্য রোদ উঠলে সেটা বেশ উপভোগ করা যায়। জাপানের ষ্টেসনে বেশ বড় waiting room আছে—বেশ মক্‌মল্‌ দেওয়া প্রশস্ত বস্‌বার জায়গা থাকে। তবে মেজেটা জল দিয়ে ধোয়া সে জন্য কাদা হয়ে থাকে। এ দেশের ঘরে রাস্তায় এমন কি রেলের গাড়ি ও ট্রামের ভিতরেও ধুলো নিবারণ করার জন্য জল ঢালা ওদের একটা বাতিক। ধুলো নিবারণের এটা খুব বড় উপায় বটে, কিন্তু সে জন্য রাস্তা ঘাট সর্ব্বদাই কর্দ্দমময় হয়ে থাকে ও বড় অপরিষ্কার দেখায়। কিয়োটো থেকে নারা কয়েকটা মাত্র ষ্টেসনের পথ, সে জন্য আমরা দ্বিতায় শ্রেণীর গাড়িতে উঠ্‌লাম। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বিশেষ পার্থক্য নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াও প্রথমের ঠিক অর্দ্ধেক নয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলির বসবার জায়গা প্রায় প্রথম শ্রেণীর মতই। বেঞ্চগুলির প্রায় সবই মক্‌মলাবৃত। সমস্ত গাড়িটার দুপাশেই লম্বা বেঞ্চ আছে। আমাদের দেশের গাড়ির মত এতে অনেক কম্পার্টমেণ্ট নাই, সমস্ত গাড়িটাতে একটা মাত্র কম্পার্টমেণ্ট। তা ছাড়া এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে যাবার উপায় আছে। এই কারণে সর্ব্বদাই গাড়ি চলার অবস্থায় রেলের চাকর এসে গাড়ির ভিতরে মেঝেটা ঝাট দিয়ে ও পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। মেঝেতে একটা করে পিক্‌দানি থাকে, সে গুলিও রীতিমত

পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। গাড়ি থামলে সব ষ্টেসনে জাপানি খাদ্যদ্রব্য ও চুরুট বিক্রি হয়। আমরা এক ঘণ্টা পরে নারা ষ্টেসনে এসে পৌঁছলাম। আগেই বলেছি এদেশের গাড়িতে চাপলে একটা ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকে। গাড়ি ভরা লোক কিন্তু সব চুপ করে বসে আছে, কেউ জোরে কথা বলে না। আমাদের গাড়িতে ৪।৫টা জাপানি ছোট ছেলে ছিল—তাদের মা বাপও সঙ্গে ছিল। কিন্তু তারাও মোটে গোলমাল করে নি;



নারার হরিণ

বেশ শান্তভাবে হাঁটু গেড়ে জান্‌লার দিকে মুখ করে বাইরের দৃশ্য দেখ্‌ছে ও সঙ্গে যে মিষ্টান্ন এনেছে মাঝে মাঝে তাই খাচ্ছে, মোটে কান্নাকাটি নাই। জাপানি ছেলেরা খুব খেতে পারে; আবার অতিরিক্ত মিষ্টিই খায়, সে জন্য ছোট অবস্থা থেকেই তাদের দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। আগেই বলেছি জাপানিদের দাঁতগুলো দেখতে বড় অপরিষ্কার, ওদের ছেলে বুড়ো

সকলের মধ্যেই এটা দেখা যায়। জাপানে আর একটা ব্যাপার বড় খারাপ লাগে, সেটা হচ্ছে সেখানকার দুর্গন্ধ; মনে হয় ওদের নাক ছোট বলে ওদের ঘ্রাণ-শক্তিটা কিছু কম, তাই ওরা দুর্গন্ধ অনুভব করে না। রাস্তার ধারে নর্দ্দমাগুলো অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং তাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। তা ছাড়া আবার যেখানে সেখানে পায়খানা। সে সব জায়গার কাছে তো যাওয়াই যায় না, দূর থেকেও ভয়ানক দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। নারা ষ্টেসনে নেবে ষ্টেসন থেকে বেরুলেই একটা চা খাবার ঘর আছে। কিন্তু তার কাছে খাবার যো নেই, কারণ তার পাশেই একটা পায়খানা আছে। আমাদের কোটগুলো ষ্টেসনে জিনিষ রাখ্‌বার ঘরে রেখে এবং তার নিদর্শন স্বরূপ একটা টিকেট নিয়ে আমরা বাইরে এসে চারখানা রিকৃশ ভাড়া করে নিলাম। সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত রিকৃশর সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত হলো। এই ছয় ঘণ্টার মধ্যে তারা সমস্ত নারাটা আমাদের দেখিয়ে আনবে; প্রতি রিকশতে ২ ইয়েন্‌ লাগবে। ষ্টেসন ছেড়ে আমরা নারার বাজারের মধ্যে দিয়ে চল্লাম। জাপানের সব বাজারই একই ধরণের বলে মনে হয়। খাবারের দোকানের অন্ত নাই। দোকান ছাড়িয়ে একটা বড় পুকুর ও বাগানের কাছে আসা গেল। সেখানে অনেক হরিণ। হরিণগুলো কিন্তু একেবারে পোষমানা। বড় বড় শিংওয়ালা হরিণ আছে, তারাও একেবারে পোষা জন্তু। লোকে তাদের গায়ে হাত দিয়ে আদর করছে, খেতে দিচ্ছে। ঐ খানেই তাদের খাওয়াবার জন্য এক রকম গোল গোল কালো গুড়ের মত চাকতি বিক্রি করছে। সেগুলি অল্প দামে পাওয়া যায়। তাই কিনে লোকে হরিণদের আদর করে খাওয়ায়। আমার স্বামী আমাদের ছেলেকে হরিণদের খাওয়াবার জন্য ঐ চাকতি কয়েকটী কিনে দিলেন। তারপর আমরা একটী মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দিরটা পাহাড়ের উপরে। সিঁড়ি দিয়ে

উঠে যেতে হয়। রিক্‌শগুলো নিচেই রইল। এ জায়গাটা বড়ই সুন্দর চারদিকে পার্ক; তার মধ্যে হাজার হাজার হরিণ চরছে। ইচ্ছে করেই বুনো অবস্থায় রাখা হয়েছে। তাই খুব স্ব



বীরেন্দ্র সদয় নারাপার্কে হরিণকে খাওয়াইতেছেন

বলে মনে হয়। আমরা যে সময়ে মন্দিরে উঠ্‌ছিলাম, সেই সময় কতগুলি জাপানি তীর্থ যাত্রী (Pilgrim) মন্দির দেখে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের কাপড়চোপড় বড় নতুন ধরণের। আমার স্বামী তাদের ছবি নিলেন। মন্দিরটা বিশেষ সুন্দর নয় তবে জায়গাটা বড় সুন্দর; বড় বড় পুরাতন গাছও আছে। লোক মন্দিরে পয়সা দিচ্ছে ও পূজা করছে। মন্দিরের নিকটেই দোকান আছে—সেখানে ছোট খাট অনেক রকমের খেলনা ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। জিনিষগুলি দূর থেকে দেখ্‌তে বেশ লাগে, কিন্তু কিনতে আগ্রহ হয় না। প্রথমতঃ দাম বড় বেশী; দ্বিতীয়তঃ জিনিষগুলি ভাল করে দেখ্‌লে অত্যন্ত খেলো ও ফঙ্গবেনে বলে মনে হয়। আমরা

এখানে কয়েকটী মন্দির দেখ্‌লাম। কিন্তু আগেই বলেছি এখানে একটা মন্দির ঠিক অন্যটারই মত। আমরা সঙ্গে লাঞ্চ্‌ এনেছিলাম কারণ এখানে জাপানি হোটেলে খাওয়া আমাদের চলবে না। সঙ্গে যে জাপানি ভদ্রলোকটী এসেছিলেন তাঁর খাবারের সুবিধার জন্যে আমরাও একটী জাপানি রেষ্টরাঁতে গেলাম। নিচের তলায় একটা টেবিল ও কয়েকখানি চেয়ার ছিল। মনে করেছিলাম ঐখানে বসেই লাঞ্চ খাব; কিন্তু সেখানে এত লোকের ভিড় যে বসার সুবিধা হ'ল না। এখানেও জাপানি মেয়ে পুরুষ ছেলে-পিলে নিয়ে বেড়াতে ও মন্দির দেখতে এসেছে। এদের তীর্থ-স্থানে বা সৌন্দর্য্য-স্থানে লোক-সমাগম দেখ্‌লে মনে হয়, জাপানিদের কাজ কর্ম্ম নাই, সব সময়ই বুঝি এরা নির্ম্মল বায়ু ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করে বেড়ায়! রেষ্টরাঁ থেকে একটা উঁচু পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। সেই পাহাড়ের উপর এই দুপুরের রোদে ছেলেপিলে সঙ্গে নিয়ে জাপানি মেয়ে পুরুষেরা উঠ্‌ছে। নির্ম্মল বায়ু ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করার ইচ্ছা এদের স্বভাবগত।

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বা নির্ম্মল বায়ুর অভাব নাই; অভাব আছে কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মল বায়ু উপভোগ করবার শিক্ষার ও ইচ্ছার। আমাদের দেশে অনেক সুন্দর দৃশ্য ও অনেক সুন্দর মন্দির আছে, সে সব দেখতে ও তাদের মর্য্যাদা বুঝতে বাইরের লোক আসে, ভারতবাসী ক'জন যায় জানি না। কিন্তু জাপানবাসী নিজেদের তীর্থ-স্থান ও সৌন্দর্য্য-স্থান দেখতে ও উপভোগ করতে এক জন দুজন যায় না, দলে দলে যায়। এ সব জায়গায় সত্যই জাপানি ছাড়া অন্য দেশের লোক খুব কম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বিদেশীদের আধিপত্যটা যে কত বেশী তা এদেশে এলে ভাল করে অনুভব করা যায়। এখানে আমরা কত জায়গায় ঘুরলাম, কত মন্দির দেখলাম; কিন্তু সব জায়গায় মিলে দুএকটী ছাড়া বেশী

বিদেশী লোক নজরে পড়েনি। যা' হোক্ রেষ্টর াঁয়ের উপরে একটা ঘরে গিয়ে আমরা মেঝেতে বসে একটী ছোট জল-চৌকির মত টেবিলে আমাদের খাদ্য-দ্রব্যগুলি রাখ্‌লাম। উপরে আসবার আগে আমাদের জুতো খুলে আসতে হয়েছিল। উপরে উঠেই কাঠের একটা পেসেজ্; তার দুধারে ছোটো ছোটো অনেক গুলি ঘর। সব গুলিরই মেজেতে জাপানি মাদুর পাতা এবং ঠিক মাঝখানে একটা করে নিচু টেবিল।



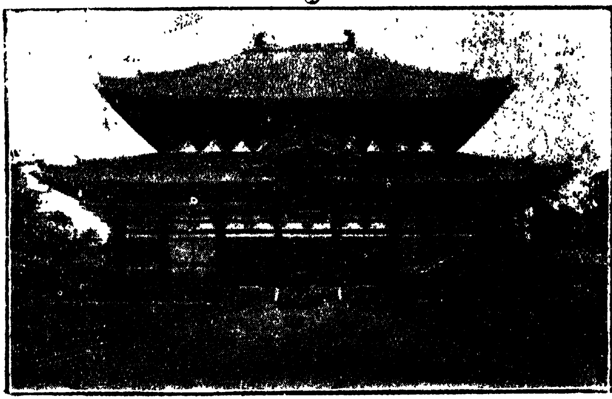
জাপানি তীর্থযাত্রী

আমরা যে ঘরে বস্‌লাম সেখানে একখানি ছবি ছাড়া আর আসবাব-পত্র নাই। দু সার ঘরের বাইরের দিকে একটা করে সরু বারাণ্ডা আছে। আমরা ঘরের মধ্যে বসে আমাদের সঙ্গে যে sandwich ও ফল এনেছিলাম তাই খেলাম। মিঃ একাবুচির কিন্তু আমাদের খাবারে পেট ভর্‌ল না। সে জাপানি লাঞ্চ খাবে বল্লে, তার জন্য তাই অর্ডার দেওয়া গেল। সে খুব পেট ভরে কতকগুলো ভাত, সুট্‌কি মাছ, দুর্গন্ধওয়ালা সুরুয়া ইত্যাদি খেলে। লাঞ্চ শেষ হলে আমরা আবার রিক্‌সা করে বেরুলাম।

দৈবৎসু মন্দির

এবারে "দৈবৎসু" মন্দির দেখতে যাওয়া গেল। "দৈবৎসু" মানে "বড় বুদ্ধ"। এখানে ঢুকতে টিকিট কিনতে হলো। এ পর্য্যন্ত যত মন্দির দেখেছি তার মধ্যে এটাই সব চেয়ে বড় ও সুন্দর। যদিও ধরণটা অন্য মন্দিরের মতই, তবু খুব প্রকাণ্ড বলে এর একটা বিশেষত্ব আছে। মন্দিরের ফটকে ঢুকে একটু সোজা গিয়েই সিঁড়ি আছে। তাতে উঠলে একটা প্রকাণ্ড ঘর দেখা যায়—সেখানেই বুদ্ধের একটা প্রকাণ্ড কাল পাথরের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটা দৈর্ঘ্যে ৫৩½ ফিট এবং কেবল তার হাতের চেটোটাই ৫।৬ ফিট্। এমন প্রকাণ্ড বড় মূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নি। ঘরের মধ্যে থাকায় সেটাকে যেন ছোটো দেখায়। বুদ্ধ-মূর্ত্তির দুধারে বোধিসত্ত্বের দুটা সোণালী রঙের মূর্ত্তি আছে। বুদ্ধের মূর্ত্তিটা একটা প্রকাণ্ড পাথরের পদ্মের উপরে স্থিত। এ মূর্ত্তিটা দেখলে মনে সত্যি একটা গর্ব্ব হয়। আমাদের দেশের এক জন মহাপুরুষ তাঁর নিজের দেশ থেকে কত দূরে এসে সম্মানিত হয়েছেন, এটা কি আমাদের পক্ষে কম গর্ব্বের কথা? কিন্তু মনে লজ্জাও হয় যে আমাদের নিজের জিনিষের মর্য্যাদা আমরা বুঝলাম না, অপরে তাঁর ধর্ম্ম বুঝে তাঁকে আদর ও সম্মান করলে। জাপানের লোক সত্যই তাঁরই যোগ্য সম্মান দেখিয়েছে। এদের উপর এজন্যে একটা ভক্তির ভাব উদয় হয়। মন্দিরের এক জন লোক নাম লেখবার জন্য আমাদের হাতে একটা বই দিলে। নাম লিখে পয়সা দিতে হলো, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে একটা কাগজে বুদ্ধের এই সুন্দর মূর্ত্তির একটা ছবি দিলে। শুনা গেল এই মূর্ত্তিটা এক জন জাপানি সম্রাট তৈরি করেছিলেন। এরা বলে, তিনি দেবতাদের সাহায্যের দ্বারা এ,

কাজটী সম্পন্ন করেছিলেন। এমন প্রকাণ্ড সুন্দর মূর্ত্তি তৈরি করা বড় সহজ কাজ নয় বলেই, বোধ হয় এই প্রবাদ। এখান থেকে আমরা মিউজিয়াম দেখ্‌তে গেলাম। এটা কিয়োটো মিউজিয়ামের মত বড় নয় এবং এতে সে রকম সুন্দর জিনিসও নাই, তবে অনেক মূর্ত্তি ও ছবি আছে ; এখানকার মিউজিয়ামেও আমাদের বুদ্ধদেবেরই রাজত্ব। মিউজিয়াম থেকে আরও দু একটা মন্দির দেখে আমরা ষ্টেসনে এলাম। কিয়োটো পৌছতে পাঁচটা বেজে গেল। কিয়োটো ষ্টেসনে এসে কাল সকালে



দৈবৎসু মন্দির

টোকিও যাবার টিকেট কিনতে যাওয়া হলো। কিন্তু Express এর প্রথম শ্রেণীতে জায়গা পাওয়া গেল না, কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনতে হলো। মিঃ একাবুচি কাল সকালে আমাদের বাক্স ষ্টেসনে আন্‌বেন ও আমাদের সব বিষয়ে সাহায্য করবেন বল্লেন। তিনি আমাদের ট্রাম করে হোটেল পর্য্যন্ত পৌছে দিলেন। ট্রামে এক জন লোক মিঃ একাবুচিকে

জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা আমেরিকার লোক কি না। মিঃ একাবুচি বল্লেন, আমরা ভারতবর্ষের লোক। তাই শুনে লোকটার মুখে হাসি ধরে



দৈবৎসু বুদ্ধের মূর্ত্তি

না, সে জাপানিতে বল্লে "এঁরা আমাদের বুদ্ধের দেশের লোক!"

আমাদের উপর তখন তার কত ভক্তি! তখনই আমাদের ট্রাম থেকে নাম্‌তে হলো, সে অনেকবার মাথা নেড়ে হেসে আমাদের বিদায় দিলে। জাপানিরা আমার কাপড় দেখে বড় আশ্চর্য্য হয়ে যায় ও হাঁ করে চেয়ে থাকে কিন্তু যখন জানতে পারে যে আমরা ভারতবর্ষের লোক তখন তারা খুব সম্মান দেখায়। কাল সকালে আমরা টোকিও যাব সে জন্য বিকেলটা বাক্স বন্ধ করবার কাজে ব্যস্ত রইলাম। বড় বাক্সগুলি নিয়ে মিঃ একাবুচি কাল সকালে সাতটার সময় ষ্টেসনে গিয়ে "বুক্" করবেন। সে জন্য সে গুলি আজ রাত্রে বন্ধ করা হলো। সঙ্গে দু চারটী মাত্র ছোট বাক্স রাখলাম।

টোকিয়োর পথে

৭ই জুন—

আজ আমরা কিয়োটো ছেড়ে যাব—খুব সকালে উঠে বাক্সগুলি বার করে দিয়ে আমরা স্নান ইত্যাদি সেরে নিলাম। মিঃ একাবুচি হোটেলের "বয়" সায়তোসানকে দিয়ে আমাদের জিনিষ নিয়ে ষ্টেসনে গেলেন। ব্রেকফাষ্টের পর আমরা তিনখানি রিক্‌শা করে ষ্টেসনে এলাম। রিক্‌শাগুলি সব ছোট ছোট গলির ভিতর দিয়ে চললো; কিন্তু সে সব গলির ভিতরে কি দুর্গন্ধ! এদের বাড়িগুলি এত পরিষ্কার অথচ নর্দ্দমা গুলি ভয়ানক ময়লা ও দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট কেন, তা বোঝা যায় না।

ষ্টেশনে এসে দেখা গেল তখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। মিঃ একাবুচি সব বাক্স 'বুক্' করে রেখেছিলেন। আমাদের আর কিছু কর্‌তে হলো না; "ওয়েইটিং রুমে" (waiting room) এ বসা গেল এবং গাড়ি আস্‌বার অল্প আগে প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'এক্‌স্‌প্রেস্' (express) গাড়ির জন্য কি চমৎকার বন্দোবস্ত। টিকেটে লেখা ছিল আমাদের সিট্ তৃতীয় গাড়িতে আছে, সেই মতে যেখানে তৃতীয় গাড়ি দাঁড়ায় আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। ট্রেন আস্‌তেই সেই তৃতীয় গাড়িখানি আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। নারা যাবার জন্য সেদিন আমরা যে রকম গাড়িতে গিয়েছিলাম এ গাড়ি গুলিও ঠিক তেমনি। আমাদের গাড়িতে তখন লোক খুব বেশী ছিল না, কিন্তু পরে একেবারে ভোরে গেল। গাড়ি ছাড়বার আগে প্রায় দশ মিনিট ধরে টুং টুং টুং শব্দে একটী ঘণ্টা বাজে, তার পর সিটি দেয়, শেষে গাড়ী ছাড়ে। মিঃ একাবুচি

ও হোটেলের চাকরটা গাড়ি ছাড়া পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। এ সব গাড়িতে দুধারে লম্বা বেঞ্চ আছে সে জন্য দিনের বেলায় শুধু বসবার মত সিট্ পাওয়া যায়। আমাদের দেশের অভ্যাস মত পা তুলে আরামে বসা যায় না। আমাদের দেশের চেয়ে এ দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঢের বেশী লোক যাতায়াত করে। লম্বা যাত্রার পক্ষে এ রকম এক জায়গায় বসে থাকতে বড় কষ্ট হয়। ঘুম পেলে লোকে বসে বসেই ঘুমোয়। ট্রেনে চড়লে এদের যে কত সংযম তা বেশ ভাল করে উপলব্ধি করা যায়। এত লোক এক গাড়ির কামরায় বসে আছে অথচ একটু চেঁচামেচি নাই। এদের ছেলেপিলেও কাঁদতে জানে না মনে হয়। তারা হয় জান্‌লার ধারে মুখ বাড়িয়ে আছে, নয় খাচ্ছে বা ঘুমুচ্ছে—কান্নাকাটি বা গোলমাল মোটেই নাই। জাপানিরা যে খুব খেতে পারে তার কোন ভুল নাই। একটি জাপানি মেয়ে বসে প্রায় সমস্ত সময় ভাত ও শুক্‌নো মাছ ইত্যাদি কিনে খাচ্ছিল। ওদের খাওয়া দেখে বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়। এক সঙ্গে কিন্তু বেশী খায় না—অল্প মাত্রায় অনেকবার খায়। ষ্টেশনে ছোট ছোট মাটির চা-দানিতে চা বিক্রি হয়। চা-দানির উপর একটা বাটি থাকে সেটায় চা ঢেলে খেতে হয়। প্রায় সমস্ত সময়ই এরা এই চা খাচ্ছে। চা মানে গরম জলে শুধু চায়ের গুঁড়ো পাতা, তাতে চিনি দুধ বা অন্য কিছু দেয় না। এদের আমি কখনও জল খেতে দেখি নি। হয় চা খায় নয় সাকি মদ খায়। বাইরের দৃশ্য অতি সুন্দর। এমন একটু জমি দেখলাম না যেখানে কোন রকম ফসল নাই। ট্রেনে যেতে যেতে কত রকমের যে ফসল দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা বলেই শেষ করা শক্ত—যব, আলু, কড়াইশুটী, কপি ইত্যাদি নানা রকমের ফসল মাঠে পাশাপাশি ক্ষেতে দিয়েছে। সমস্ত মাঠগুলি যেন একটা সব্‌জির বাগান বলে মনে হয়। এরা প্রায় সব ফসলই আইল করে তার উপরে রোপন করে। আমাদের দেশে

আলু যে প্রথায় লাগায় এখানে প্রায় সব ফসলই সেই রকম আইল করে রোপন করা হয়। তাতে কম জায়গায় বেশী ফসল পাওয়া যায়। তা ছাড়া ফসল পাক্‌লেই চাষারা ঐ আইলের মধ্যে খালি জায়গায় অন্য ফসল রোপন করে। আমরা দেখ্‌লাম যে যব লাগান হয়েছিল, তার কাট্‌বার সময় এসেছে, তাই এখন দুই আইলের মাঝের জায়গায় আবার অন্য সব্‌জি বা ফসল লাগানো হচ্ছে। যব কাটা হয়ে গেলে জমিটা পাছে পড়ে থাকে, তারি জন্য এই ব্যবস্থা। টৌকিয়োর কাছাকাছি একটি জায়গায় ফলের বাগান দেখা গেল। বাগান ফলের গাছগুলি বেশি উঁচু নয়। আন্দাজে মনে হলো এগুলি পিচ্‌ কিম্বা পেয়ার ফলের গাছ হবে। অনেক ফল গাছে ধরে আছে। ফলগুলির এক একটীকে কাগজে মুড়ে বেঁধে দিয়েছে। এক এক গাছে হাজার হাজার এমনি কাগজ বাঁধা ফল ঝুল্‌ছে। এরা যে জিনিসের পাট করে সেটা ভাল রকমেই করে। মাঠে দেখা গেল মেয়ে-পুরুষ দুয়েই কাজ করছে। এখানে রোদের তেজ আমাদের দেশের মত নয়, তাই চাষারা কাপড় পোরে কাজ করে। আবার মাথায় টুপিও দেয়। কাজের সময় চাষার মেয়েরা কিমোনো ব্যবহার করে এবং মাথায় টুপিও দেয়—টুপিগুলি প্রায় বেতের তৈরি। চাষীরা ছেলেপিলে ঘরে রেখে মাঠে আসে না। অনেক সময়ই বেতের ছোট গাড়িতে মাঠের মাঝখানে ছোট ছেলেদের শুইয়ে রেখে তাদের কাজ করতে দেখা যায়। এ ব্যবস্থাটা খুবই ভালো—বাপ মায়ের এতে কাজের অসুবিধা হয় না অথচ ছেলেরা বাইরের খোলা হাওয়ায় থেকে সবল হয়। এ দেশের ক্ষেতে জলের অভাব নাই—যেখানে ধানের চারা লাগিয়েছে বা সবে যে ক্ষেতে ধান রোপন করেছে সে সব ক্ষেতে জল ভরা রয়েছে। কোথায়ও মাটি শুকনো দেখলাম না। এদের জল-চলের খুবই সুবন্দোবস্ত আছে।

এখন ট্রেনের মধ্যে তাহাদের আচার ব্যবহারের কথা বলি।



চাষ

ট্রেনে খাবারের "কার" (গাড়ী) আছে। একটার সময় ছোট ছোট লাল কাগজ পাওয়া যায় তাতে টিফিন তৈরি আছে বলে লেখা থাকে। ব্যস্, কাজ হয়ে গেল; কথা বলবার দরকার হল না! কাগজে ইংরাজি ও জাপানি দুই ভাষাতেই লেখা থাকে। আমরা উঠে গিয়ে মুখ হাত ধুতে স্নানের ঘরে গেলাম। ২।৩টা গাড়ি পেরিয়ে এই ঘর থাকে। এক দিকে স্নানের ঘর অন্য দিকে লেভেটারী (পায়খানা)। স্নানের ঘরে আমাদের দেশের ট্রেনে যেমন কল দেওয়া মুখ ধোবার চিলিম্চি থাকে, এখানেও তাই; তার উপর সাবান ও তোয়ালেও আছে দেখা গেল, এক গাদা ছোট ছোট পরিষ্কার তোয়ালে রাখা হয়, সে গুলি যেমন খরচ হয়ে যায় অমনি লোক এসে সে গুলো নিয়ে যায় এবং আবার এক তাড়া পরিষ্কার তোয়ালে রেখে যায়। দেখলাম সাবানটা সাধারণ সাবানের মত নয়। জোলো সাবান একটা টিনে রয়েছে; সে টিনটার ঢাকনাতে একটা ছোট ছেঁদা আছে, সাবান দরকার হলে পাত্রটা ওল্টালেই একটু জোলো সাবান ছেঁদা দিয়ে বার হয়। সেটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে মাখলে কিন্তু খুব ফেনা হয়। এই উপায়ে এক লোকের ব্যবহার করা সাবান বা তোয়ালে অন্য লোকের ব্যবহার করতে হয় না। এদের লেভেটারি (পায়খানা) গুলি কিন্তু বড় অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। এমন দুর্গন্ধময় লেভেটারি আমি আগে কখনও দেখি নাই। এরা ফিনাইল্ ব্যবহার করে না, ফিনাইল্ জিনিসটা বোধ হয় এদের জানা নাই। মুখ হাত ধুয়ে ডাইনিং সেলুনে খেতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেলুনটা একেবারে লোকে পরিপূর্ণ। ডাইনিং সেলুনের লোকগুলো আমাদের ধূমাগারে একটু অপেক্ষা করতে বল্লে; অর্থাৎ এ দলের খাওয়া শেষ হলেই আমাদের খেতে দেবে। ধূমাগারে আরও কতকগুলি জাপানি যাত্রী খাবারের অপেক্ষায়

বসেছিল। জাপানে জাত বিচার নাই, সে জন্য অনেক জাপানিই ডাইনিং সেলুনে খায়। লাঞ্চটা খুব ভাল ছিল না। যা হোক্ খাওয়া সমাপ্ত হলে ৪।৫ খানা গাড়ি পেরিয়ে নিজেদের গাড়িতে এলাম! এ দেশে খুব "করিডোর" (বারান্দা-ওয়ালা) ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। ট্রেন চলা অবস্থাতেই চাকর বাকর এসে যাত্রীদের আরামের বিষয় খোঁজ খবর করে। মধ্যে মধ্যে এসে গাড়ির মেঝেটা ঝেঁটিয়ে দিয়ে যায়, বেশী



ধান রোপন

ধূলা হলে জল ছিটিয়ে দেয়। রেল গাড়ি চলেছে অথচ জাহাজের অনুরূপ সব কাজ চাকরেরা করে যাচ্ছে; চলা গাড়িতেই মানুষ খাবার ঘরে গিয়ে খেয়ে আসছে; এ সব খুবই আরাম-জনক। এ দেশে চুরিটা বোধ হয় বেশী হয় না। আমাদের দেশে এ রকম এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে যাবার বন্দোবস্ত থাকলে অনেক চুরির সম্ভাবনা থাকত। মধ্যাহ্নে একটু ঘুমিয়ে নিতে হলে, শোবার উপায় নাই।

পাঁচটার সময় আবার ডাইনিং সেলুনে গিয়ে চা খেলাম। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ফুজি পাহাড় দেখতে পাওয়া যায় শুনেছিলাম ; কিন্তু



ধানের চারা রোপণ

আজ মেঘ হওয়ায় আমাদের ফুজি পাহাড় দেখা ঘট্‌লো না। আমরা মনে করলাম হয়ত হোটেলে ডিনার পাওয়া যাবে না, সে জন্য ছটায় "ডাইনিং কারে" যে ডিনার দিচ্ছিল, তাই খাওয়া গেল।

টোকিও সহরে

ঠিক ৮-২৫ মিনিটে গাড়ি টোকিওতে এসে পৌঁছল। হোটেল থেকে কোন লোক বা পোর্টার আসেনি, ষ্টেসনেরই একজন পোর্টার আমাদের জিনিস পত্র বার করে আনলে। কিন্তু ষ্টেসনের বাইরে হোটেলের লোক ছিল। তাকে অন্য মাল পত্রের রসিদ দিয়ে আমরা টেক্‌সি করে হোটেলে এলাম। টেক্‌সিতে ১॥ ইয়েন অর্থাৎ প্রায় দু টাকা দিতে হলো। হোটেলের দরজার সামনে হোটেলের প্রোপ্রায়টার নিজে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের তেতলায় নিয়ে গেলেন ও সেখানে তিনটী ঘর দেখালেন। যেটী সব চেয়ে বড় সেটী আমরা পছন্দ করলাম। আমাদের ঘরের নম্বর ২১ হলো। কোট ইত্যাদি রেখে আমরা নিচে গিয়ে "সাপার" খেলাম। প্রোপ্রায়টার লোকটী বিলাতি। এ হোটেলটা এখানকার অন্য হোটেলের মত জাপানি প্রোপ্রায়টারের নয়। বৃদ্ধ প্রোপ্রায়টার লোকটী বেশ ভদ্র বলে মনে হলো। তিনি আমাদের কি রকম খাদ্যের দরকার সব জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের রুচি মত তাঁকে সব জানালাম, তিনি তার বন্দোবস্ত করবেন বল্লেন। হোটেলটীতে আর সব সুবিধা আছে কিন্তু স্নানের ঘরে সব সময় গরম জল পাওয়া যায় না। এ হোটেলে সবই ইউরোপীয় বোর্ডার। লোকগুলি বেশ ভদ্র, নিজে এসে আলাপ পরিচয় করে।

৮ই জুন—

আজ সমস্ত দিন আমার শরীরটা খারাপ আছে, সে জন্য বেরুলাম না। আমার স্বামী বিলাত যাবার প্যাসেজের ব্যবস্থার জন্য মিঃ আসানোর

কাছে গেলেন। মিঃ আসানো জাহাজের একজন বড় প্রোপ্রায়টার। কিন্তু উনি ফিরে এসে বল্লেন, সেই ভদ্রলোকটী এখানে নাই, সপ্তাহ খানিকের জন্য কিয়োটো ইত্যাদি কয়েক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছেন; কিন্তু তাঁর আফিসের লোকেরা আমাদের নাম রেজেষ্টারী করে নিয়েছেন।

৯ই জুন—

আমাদের বিলাত যাবার প্যাসেজ পাওয়াতে বড়ই মুস্কিল দেখা গেল, কিন্তু যথা সাধ্য চেষ্টা ত করতেই হবে। সে জন্য আমার স্বামী আজ Yokohama (ইয়াকোহামা) গেলেন। সেখানেই সব জাহাজের এজেণ্টদের আফিস। আমার শরীরটা আজ অত্যন্ত খারাপ সে জন্য বিছানায় শুয়েই রইলাম; উপরে কিছু খাবার দিয়ে গেল। লাঞ্চ্ খেতে নিচে গিয়েছিলাম কিন্তু তারপর শরীর আরও খারাপ লাগছিল। আমার স্বামী সকালে খেয়ে ইয়াকোহামা চলে গেছেন, সেখানেই লাঞ্চ্ খাবেন। চায়ের পর আমরা ওঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু ছটা বেজে গেল তবুও উনি ফিরলেন না দেখে আমাদের একটু ভাবনা হল। ইতি মধ্যে উনি এসে পৌছলেন। এসে বল্লেন, এমেরিকা হয়ে পেসেজ পাওয়া সম্ভব নয়, তবে P & O কোম্পানীরা বলেছে ইয়াকোহামা থেকে বোম্বে পর্য্যন্ত প্যাসেজ দিতে পারে, কিন্তু বোম্বে থেকে লণ্ডন পর্য্যন্ত দিতে পারবে কি না তা জানা গেল না।

১০ই জুন—

আজও আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ। সমস্ত দিন শুয়ে থাক্‌তে হলো। আমার স্বামী Indo-Japanese Associationএর লোকদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কিন্তু সে জায়গাটা খুঁজে পেলেন না। কিন্তু মিঃ মজুমদার নামে একজন বাঙ্গালীর বাড়ি রাস্তায় দেখে তাঁর সঙ্গে

দেখা করতে গিয়েছিলেন। সে ভদ্রলোকটি বাড়ি ছিলেন না, সে জন্য তাঁর বাড়িতে কার্ড রেখে চলে এসেছিলেন।

১১ই জুন—

আজ আমার শরীর আরও খারাপ হলো ভয়ানক সর্দ্দি কাশি হয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার মত মনে হলো সে জন্য বিছানা ছাড়লাম না। সকালেই সেই মিঃ মজুমদার ভদ্রলোকটি এলেন। আমার স্বামী তাঁর সঙ্গে নিচে গিয়ে আলাপ করলেন। ভদ্রলোকটীর স্ত্রী এখানে নাই। তিনি আমাদের সঙ্গে কামাকুরা, নিক্কো ইত্যাদি জায়গায় যাবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। বিকেলে আমার জ্বরই হলো। বিদেশে অসুখ হওয়ায় আমার স্বামী অত্যন্ত ভীত হলেন, তখনই তিনি হাসপাতালের একটী ডাক্তারকে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন। ডাক্তার সন্ধ্যার সময় এলেন, ডাক্তারটী জাপানি। আমাকে দেখে বল্লেন সবই খেতে পারি। একটা ঔষধও লিখে দিয়ে গেলেন। জাপানি ডাক্তারের কথায় কিন্তু সব খেতে সাহস হলো না, শুধু দুধ ও বিস্কুট খেয়ে থাকলাম।

১২ই জুন—

আজ বেশ ভালই আছি। তবে সকালে কোথায় বেরুলাম না। উনি Indo-Japanese Associationএ গেলেন।

দেশে মিঃ ও মিসেস কেব্রেরা বলে একটী দম্পতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। মিসেস্ কেব্বেরার মা জাপানি মহিলা এবং বাপ ইউ-রোপীয়—তাঁর নাম মিঃ ডিউয়ার। মিসেস্ কেব্রেরা আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্যে তাঁর মা ও ভগ্নিদের লিখেছিলেন। তাই বিকেলে আমরা এই ডিউয়ার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। জাপানের রাস্তা বের করা একটী খুব শক্ত কাজ।

আমরা রিকশা করে গেলেও বাড়ি খুঁজে পেতে সময় লাগ্‌ল। বাড়িটা জাপানি ধরণের। বাড়ির সঙ্গে বাগানও আছে। জাপানি ধরণের হলেও সেটি বেশ বড় বাড়ি এবং একেবারে বিলাতি কায়দায় সজ্জিত। জাপানি কায়দা অনুসারে আমাদের জুতো খুলতে হলো না, একটি জাপানি চাকরানি ভিতরে নিয়ে ড্রইং-রুমে বসালে। তারপর মিসেস্ ডিউয়ারের একটী অবিবাহিতা কন্যা এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলেন। মিস্ ডিউয়ার জাপানি কাপড় পরেছিলেন। এরা জাপানি ও বিলাতি মিশেল বলে সাধারণতঃ জাপানি মেয়েদের চেয়ে সুন্দরী; তার মানে নাক চোখ জাপানিদের মত নয়। জাপানি পোষাকে এদের বেশ সুন্দর দেখায়। মিস্ ডিউয়ারকে দেখতে অনেকটা তার ভগ্নি মিসেস্ কেব্‌রেবার মত, রং ইংরেজদের মত নয় অথচ কালও নয়। মিস্ কেব্‌রেরা বল্লেন, ওঁরা আমাদের জন্য অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করছেন, কারণ তাঁদের কাছে মিসেস কেব্‌রেরা আমাদের কথা লিখেছিলেন। খানিক পরে মিসেস্ ডিউয়ার এলেন। ইনি একেবারে জাপানি মহিলা—কিন্তু বেশ ইংরাজি বলেন, দেখতে কিন্তু মেয়েদের মত সুন্দর নন্। অবশ্য বৃদ্ধা লোক, তা হলেও রং সাধারণ জাপানি মহিলাদের চেয়ে ময়লা। তাঁর রংটা আমাদের দেশের শ্যামবর্ণের মত। ওঁরা আমাদের খুব আদর যত্ন করলেন। মিসেস্ কেব্‌রেরা মিসেস্ ডিউয়ারের জেষ্ঠা কন্যা। দ্বিতীয় কন্যাটীও বিবাহিতা। তিনিও অল্প পরেই এলেন, তাঁর নাম মিসেস থাম্ (Mrs. Thum)। ইনি মিসেস্ কেব্‌রেবার চেয়েও দেখতে সুন্দর। এরা চার বোন, তার মধ্যে তুটী অবিবাহিতা; কিন্তু অর্থাৎ মিসেস্ থাম্‌ই বেশী সুন্দরী। ইনি আলাদা বাড়িতে থাকেন। আজ মার বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। মিসেস্ কেব্‌রেরা এঁদের জন্য আমাদের কাছে একটী পার্সেল ও চিঠি দিয়েছিলেন, সে গুলি তাঁদের

দিলাম। অনেক আলাপ পরিচয়ের পর এঁরা বুধবারে আমাদের চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন।

১৩ই জুন—

আজ সকালে মিঃ মজুমদার এসে আমদের "মিট্সুকোসি" বলে একটি বড় জাপানি দোকান দেখাতে নিয়ে গেলেন। তিনিই একটা মোটর বন্দোবস্ত করে এনেছিলেন, আমরা তাতে গেলাম। দোকানটা খুব বড় বটে, কিন্তু আমাদের মনোমত জিনিস দেখলাম না। জাপানিদের উপযোগী জিনিসই বেশী। দোকানটা বেশ সুন্দর করে সাজান রয়েছে। এখানে একটা জিনিস নূতন দেখলাম, যা আগে কখন দেখি নাই। সেটা হচ্ছে moving staircase; তার মানে এক রকমের lift। উপরে যাবার যে সিঁড়ি আছে সে'টা সমস্ত ক্ষণ আস্তে আস্তে সরে উপরে যাচ্ছে তার একটা ধাপের উপর দাঁড়ালে মানুষ-শুদ্ধ সিঁড়ি আপনি উঠে যায়,—পা ফেলে উপরে যেতে হয় না। যে ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা যায় সেটা উপরে পৌছলে নেমে পড়তে হয়। এই moving staircase বিলাতে অনেক আছে কিন্তু এখানেই এ জিনিসটা প্রথম দেখলাম। আমাদের দেশে এটা মোটেই নাই। এই দোকানে কেবল সাজ সজ্জা দেখতেই অনেক লোক আসে। প্রকাণ্ড বড় দোকান। যেখানে গাছ বিক্রি করে সে জায়গাটা খুব সুন্দর;—নানা রকমের ফুলে ভরা। জাপানিরা ফুলের আদর করতে জানে! দোকান দেখে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। এ জায়গায় টেক্সি পাওয়া যায় না। প্রাইভেট মোটর কোম্পানীরা ঘণ্টায় ছয় ইয়েন ভাড়া নেয়। আমাদের দু ঘণ্টায় ১২ ইয়েন পড়ে গেল। মিঃ মজুমদার আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেলেন। হোটেলে ফিরে শোনা গেল মিঃ ও মিসেস্ সুলতান সিংরা এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা আজই তাঁদের জাহাজ ধরতে ইওকোহামায় যাবেন, কিন্তু

বলে গেছেন যে এখানেই লাঞ্চ খেয়ে যাবেন। আমরা তাঁদের জন্য অপেক্ষা না করেই লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। তিনটায় একটা জাপানি কনসার্ট ছিল। মিঃ মজুমদার আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইলেন। মিঃ সিংরা এলে তাদের সঙ্গে দেখা করে তারপর কনসার্ট শুনতে যাওয়া হবে প্রস্তাব হলো। কিন্তু যখন দুটার পরেও সিংরা এলেন না তখন উনি স্থির করলেন একটা চিঠি লিখে তাঁদের জন্য রেখে যাবেন। ইতিমধ্যে তাঁরা সকলে এসে পড়লেন। তাঁদের সঙ্গে আর একটী দম্পতি ছিলেন। তাঁদের নাম মিঃ ও মিসেস্ পুরুষোত্তম দাস ভগবান দাস। মিঃ পুরুষোত্তম দাস ইওকোহামাতে ব্যবসা করেন। এঁদের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে জানা গেল যে, মিঃ পুরুষোত্তমের মা এবং ঠাকুরমার বাড়িতে আমার স্বামী প্রথম বিলাত যাবার সময় বোম্বেতে ছিলেন। মিঃ দাসের পিতার সঙ্গে ওঁর তখন পরিচয় হয় নি বটে, কিন্তু তাঁর মা ও ঠাকুরমা আমার স্বামীকে খুব আদর যত্ন করেছিলেন। তাঁহারা এখন ইহলোকে নাই। পুরুষোত্তম দাসের পিতা জীবিত আছেন, তিনি বোম্বেতে থাকেন। আমার স্বামী যখন এঁদের অতিথি হয়ে বোম্বেতে ছিলেন তখন এই মিঃ দাস মাত্র ৮।১০ বৎসরের বালক। এঁর মা আমার স্বামী বিলাত যাত্রার সময় জাহাজে এসে অনেক ফুলের মালা ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিতে এসেছিলেন। এঁদের কথা পূর্ব্বে আমার স্বামীর কাছে শুনেছিলাম কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে যে আবার এই সুদূর জাপান দেশে আমাদের আলাপ পরিচয় হবে তা কখনও ভাবি নাই। ভগবানের আশ্চর্য্য রহস্য! মিঃ পুরুষোত্তম দাসের পিতার এখানে বড় ব্যবসা আছে। তারি দেখা শোনা করতে তিনি এখানে এখন আছেন। সুলতান সিংরা এবং পুরুষোত্তম দাসরা সকলেই নিরামিষ-ভোজী। সে জন্য তাঁরা হোটেলে নিরামিষ লাঞ্চ্ প্রস্তুত করতে বলে গিয়েছিলেন।

তাঁরা সকলে আহারে বসিলে তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে আমরা মোটরে করে কন্‌সার্ট দেখ্‌তে গেলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় কন্‌সার্ট প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন প্রায় ২৫।৩০টী জাপানি মহিলা পিয়োনোর সঙ্গে জাপানি ভাষায় কিন্তু বিলাতি সুরে গান করছিল। শেষ 'সিন্‌'টায় বেহালার কন্‌সার্ট হলো—৫।৭টী মহিলা এবং ২০।৩০টী পুরুষ বেহালা বাজালে। সঙ্গে Cello যন্ত্র ও অন্য দু একটী যন্ত্রও বাজ্‌লো। একজন অষ্ট্রিয়া-দেশীয় ওস্তাদ এদের বাজ্‌না শেখায়। সে সময় সময় একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বেণ্ড-মাষ্টারের মত তাল দিচ্ছিল। জাপানিরা কিন্তু বেশ বেহালা বাজালে। সব কাজেই এদের এমন একটা আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায় যা আমাদের দেশে দেখি না। কনসার্ট শুনে আমরা "জুয়লজিকেল গার্ডেন" (চিড়িয়াখানা) দেখতে গেলাম। সেটা এ কন্‌সার্ট হলের খুব নিকটেই। আমাদের দেশের তুলনায় এই "জু" কিছুই নয়—এদেশে জীব-জন্তু পাওয়া যায় না; অন্যান্য দেশ থেকে কিছু সংগ্রহ করে রেখেছে। বাঘ, শ্বেত ভালুক, হাতী ও কয়েক রকমের পাখী দেখা গেল। আমাদের কাছে এ "জু" দেখবার মতই নয়; আমার ছেলের আগ্রহে দেখ্‌তে যেতে হ'ল।

ব্রিটিস এম্বেসি

১৪ই জুন—

আজ সকালে আমার স্বামী "বৃটিস এমবেসি" (ব্রিটিস্ রাজপ্রতিনিধির আফিস) ও agricultural office (কৃষি আফিস্) এ গেলেন। ব্রিটিস্ এম্বেসিতে ওঁকে প্রথমে দেখে একজন অফিসার ছাত্র ভেবেছিল, কিন্তু উনি যখন বাঙ্গালার গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর চিঠি দেখালেন তখন খুব মান সম্ভ্রম দেখালে। এমব্যাসেডার (প্রতিনিধি) তখনই বাইরে যাচ্ছিলেন, সে জন্য ওঁর সঙ্গে তখন বিশেষ বাক্যালাপ হলো না। তিনি ১৭ তারিখে আমাদের দুজনকে এমবেসিতে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন এবং কাল সকালে আমার স্বামীকে চাষ-বিষয়ক সব দেখ্বার বন্দোবস্ত করে দিবেন বল্লেন। বিকেলে আমরা মিসেস কেব্রেরার বোন্ মিসেস থামের বাড়ি গেলাম। আমাদের বেরুতে একটু দেরীই হয়ে গেল। এখানে থেকে প্রথমে রিক্শ তারপর ট্রামে গেলাম। একজন পুলিশ ওদের বাড়ি কোন দিকে দেখিয়ে দিলে, তাই অল্প খোঁজাখুঁজির পরে বাড়িটা পাওয়া গেল। জায়গাটা কিন্তু বড় সুন্দর ও নির্জ্জন। মিসেস থামের অবিবাহিতা ভগ্নী এবং দুচার জন বন্ধু এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের দেরী হওয়ায় তাঁরা চলে গেছেন শুন্লাম। তবে দেরীতে এসে এক সুবিধা হলো যে মিঃ থামের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর আফিস থেকে ফির্তে সন্ধ্যে হয়েছিল। মিসেস থাম্ আমাদের খুব আদর যত্ন করলেন এবং চা খাওয়ালেন। আমাদের মোটর করে এক দিন হিবিয়া পার্ক ও থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাবেন বল্লেন। মিঃ থাম্ লোকটী বেশ ভালই মনে হলো। তিনি সুইডেন দেশীয়। তাঁরা ডিসেম্বর মাসে সুইডেন যাবেন বল্লেন। মিসেস থাম্

কখনও সেখানে যান নাই। তাদের একটী ছেলে ও একটী মেয়ে আছে। তারা ইংরাজি জানে না কিন্তু আমার ছেলের সঙ্গে খুব খেলা করলে। আমাদের এখানেই ৭টা বেজে গেল। মিঃ থাম্ আমাদের জন্য পেসেজ্ ঠিক্ করে দেবেন বল্লেন। তাঁদের নিজেদের মোটরেই আমরা হোটেলে ফিরলাম। ডিনারের পর হোটেলের কয়েকটী মহিলার সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো।

১৫ই জুন—

আজ সকালে কৃষি কলেজের একজন বাঙ্গালী ছাত্র ওঁকে কলেজের একজন প্রোফেসারের কাছে নিয়ে যাবার জন্য এলেন। কিন্তু সে দিন আমাদের একজন জাপানি ভদ্রলোকের বাড়ি যাবার ঠিক হয়েছিল। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলে আমাদের প্যাসেজের একটা ব্যবস্থা হবে বলে মিঃ থাম্ আমাদের আশা দিয়েছিলেন। কাজেই আমরা ঐ ছাত্রটির সঙ্গে না গিয়ে সেই জাপানি ভদ্রলোকের (মিঃ ও মিসেস্ কোমোরোর) সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁরা বাড়ি ছিলেন। প্রথমে আমরা মিসেস্ কেব্রেরার চিঠি তাঁদের ঝিকে (যাকে এদেশে "জচু" বলে) দিলাম। সে চিঠিখানা মিসেস্ কোমোরোর কাছে নিয়ে গেল এবং তারপর এসে আমাদের ড্রইং রুমে বসালে। ঘর সমস্তই বিলাতি কায়দায় সাজান, বাড়িটাও বিলাতি ধরণের। অল্পক্ষণ বাদে মিঃ কোমোরো এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলেন এবং বল্লেন যে, তাঁর স্ত্রী লাঞ্চ খেতে বাইরে যাচ্ছেন সে জন্য কাপড় পরছেন,—একটু পরে আসবেন। মিঃ কোমোরোকে প্যাসেজের কথা বলা হলো; তিনি চেষ্টা করবেন বল্লেন। অল্পক্ষণ বাদেই মিসেস্ কোমোরো এলেন। মিসেস্ কোমোরো বেশ ভাল ইংরিজি বলেন। তাঁরা আট বৎসর ইংলণ্ডে ছিলেন। সচরাচর জাপানি মহিলারা এত ভাল ইংরিজি বলেন না। ইনি বেশী দিন বিলাতে

ছিলেন বলেই বোধ হয় এত ভাল ইংরিজি শিখেছিলেন। মিসেস্ কোমোরো দেখ্‌তে বেশ ভালই। তাঁর ছয়টী সন্তান আছে, তারা সকলেই স্কুলে পড়ে। মিসেস্ কোমোরো আমাদের শুক্রবার দিন চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু সে দিন আমাদের ব্রিটিস এম্‌ব্যাসেডারের বাড়ি লাঞ্চে নিমন্ত্রণ ছিল। সে জন্য যদি লাঞ্চের পর সুবিধা হয় ত আসব, বল্লাম। ওঁদের কাছে আমাদের যদি আরও কিছু সাহায্য দরকার হয় ত জানাতে বল্লেন। কয়েক বাড়ি পরেই মিঃ ও মিসেস্ কেডোনোর বাড়ি। দেখা করবার জন্যে আমরা তাঁদের বাড়ি গেলাম কিন্তু তাঁরা বাড়ি ছিলেন না, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কাজেই কার্ড ও চিঠি তাঁদের ঝিয়ের কাছে দিয়ে আমরা চলে এলাম। তারপর তিনখানা রিক্‌শ করে আমরা মিসেস্ ড্রেস্‌লারদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁদের বাড়ি খুঁজে পেতে অনেক দেরী হলো। তাঁরা যেখানে আছেন সে জায়গাটা অনেক দূরে। যা হোক অবশেষে সেখানে পৌঁছন গেল। আমি আগে ড্রেস্‌লারদের উল্লেখ করেছি। এঁরা এমেরিকান মিসনারি ও আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। এখানকার এমেরিকান মিসান্ স্কুলে এঁরা রয়েছেন। মিসান্ স্কুলটী যে স্থানে স্থাপিত সে জায়গাটী বেশ মনোরম, নির্জ্জন ও পরিষ্কার। এখানে স্কুলের অন্য শিক্ষকরাও আছেন। ড্রেস্‌লারদের সঙ্গে এবং তাঁরা যাঁদের স্কুলে আছেন, সেই এমেরিকান মহিলাদের সঙ্গেও আলাপ হলো। ড্রেস্‌লাররা এমেরিকা যাবার প্যাসেজের জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন, এখন পর্য্যন্ত তাঁরা প্যাসেজ্ পান নাই তবে পাবার আশা আছে বল্লেন। এঁদের সকলের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হলো তারপর ৭॥০টায় হোটেলে ফিরলাম।

ইস্ ওকুমা

ওকুমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলাম। অনেক
হলো। এখানে মোটর চড়তে হলে ঘণ্টায়
হয়। আমরা নটায় বেরুলাম, সেখানে পৌছতে
আমরা যেতেই মিঃ সোয়েজিমা (ইণ্ডো-জাপানি
ং ডিরেক্‌টার) ও মিঃ সাকুরাই আমাদের দরজার
করলেন ও ড্রইং রুমে নিয়ে বসালেন। অল্প পরেই



মার্কুইস ওকুমা

মার্‌কুইস্ ওকুমা এলেন। ইনি জাপানের ভূতপূর্ব্ব প্রাইম মিনিষ্টার অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী। লোকটা খুবই বৃদ্ধ, এমন কি তিনি নিজে চলা ফেরা কর্‌তে অসমর্থ; একজন লোক তাঁকে ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিলে। মার্‌কুইস্ ওকুমার ঘর সব বিলাতি ধরণে সাজান, তবে আসবাব-পত্র এবং ছবি সবই জাপানি। জিনিস-পত্র সব খুব মূল্যবান বলে মনে হলো। মার্‌কুইস্ এসে আমাদের সঙ্গে করমর্দ্দন কর্‌লেন। তারপর মার্‌কুইস্ এবং আমার স্বামীর মধ্যস্থ হয়ে প্রোফেসর সিওজাওা (Shiozawa) দো-ভাষীর কাজ কর্‌তে লাগলেন। নানা বিষয় কথা বার্ত্তা হলো। জাপান ও ভারতবর্ষের পরস্পরের মধ্যে কি রকম

আছে এবং কি রকম হওয়া উচিত সে বিষয়
স্বামী বল্লেন যে তিনি শুনেছিলেন জাপানীরা
চক্ষে দেখেন, কিন্তু মারকুইসের কথার ভাবে
আমাদের ঠিক নয়। মারকুইস ওকুমা বল্লেন,
ওঁদের সভ্যতা অনেক বিষয়ে ঋণী। তিনি অনেকবার
আশা করেন যে নূতন রিফর্মের ফলে ভারতবর্ষের অনেক উ
তাঁহার মতে ভারতবর্ষের শিক্ষা ছাড়া আর উপায় নাই;
ভারতবর্ষ শীঘ্রই উন্নতি লাভ করবে এটা তিনি খুব বিশ্বাস ক
সব ছাড়া রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক আলোচনা হলো। আ
তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুচার কথা বল্লেন। আমি বল্লাম, জাপ
শিক্ষায় আমাদের দেশ থেকে অনেক এগিয়েছে এবং জাপানের
মেয়েদের স্কুলগুলি দেখে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তিনি বল্লেন, মেয়েদের শিক্ষা ওঁরা যা দিচ্ছেন তাতে ওঁরা সন্তুষ্ট নন। স্ত্রীশিক্ষার এখনও অনেক উন্নতির দরকার এবং তাঁদের আরও উন্নতি করবার ইচ্ছা আছে। উনি আরও বল্লেন যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানি মেয়েরা মোটেই শিক্ষিত ছিল না—ভারতবর্ষে এখন যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তখন তাও ছিল না,—সে জন্য তিনি মনে করেন যে ভারতবর্ষের উন্নতির খুব আশা আছে। লোকটী যে খুব উঁচু দরের তা তাঁর চেহারাতেই বোঝা যায়। বেশ উন্নত প্রশস্ত কপাল, চেহারায় একটা মহিমা আছে। এঁকে দেখবার আগে জাপানে যে এমন উন্নত দৃঢ় চেহারার মানুষ আছে তা কখনও ভাবি নাই। এখানে সচরাচর যে সব লোক দেখা যায় তাঁরা মোটেই দেখতে ভাল নয়, বরঞ্চ দেখলে খুব বোকা গোছের মনে হয়। কিন্তু এ লোকটীকে দেখলে বোঝা যায় জাপানের যাঁরা বড় লোক তাঁরা কি রকমের। এই বৃদ্ধকে দেখলে সত্যই ভক্তি হয়। যদিও তিনি

ইংরাজি বল্লেন না এবং আমি তাঁর কথা বুঝলাম না তথাপি তাঁর কথা-বার্ত্তার যে একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছে, তা বেশ অনুভব করা গেল। এ দেশে এসে এই প্রথম বুঝলাম যে ইংরাজি ভাষা না বল্‌তে পার্‌লেও লোকে মূর্খ বলে গণ্য হয় না। এরা নিজেদের ভাষার মর্য্যাদা বোঝে—নিজের ভাষাই আসল। তবে ইংরেজরাও যেমন নিজের ভাষার পরে অন্য ভাষা শিক্ষা করে, এঁরাও তেমনি নিজের ভাষা আয়ত্ত করে ইংরাজী, ফরাসী বা জার্ম্মান ভাষা শেখেন। মার্‌কুইস্ ওকুমা এত বড় লোক, কিন্তু ইনি ইংরাজি ভাষা মোটেই জানেন না। কিন্তু জ্ঞানে তিনি ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত অনেক লোকের চেয়েই বড়।

আমার ছেলেটীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। মার্‌কুইস্ অনেকগুলি খেলনা আনিয়ে তাকে দিলেন এবং বল্লেন যে, তিনি ছেলেপিলে খুব ভালবাসেন। তাঁর স্ত্রীর শরীর অসুস্থ বলে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারলেন না।

মার্‌কুইসের সঙ্গে প্রায় দু ঘণ্টা আমাদের আলাপ হলো। তারপর আমরা তাঁর কাছে বিদায় নিলাম। বিদায় নেবার সময় হস্ত মর্দ্দন কর্‌লাম না, নমস্কার কর্‌লাম; তাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন।

জাপানের মন্দিরে যারা পূজা দিতে যায় তারা বুদ্ধের মূর্ত্তির সম্মুখে হাঁটু গেড়ে মাথা মাটিতে ছুঁইয়ে প্রণাম করে। সে জন্য আমাদের নমস্কারের মানে মার্‌কুইস্ বুঝেছিলেন এবং আমরা তাঁকে নমস্কার করায় তিনি খুব খুসী হয়েছিলেন।

ওকুমার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ হলে মিঃ সোয়েজিমা আমাদের মার্‌কুইসের বাগান ও বাড়ির নিচের ঘরগুলি সব দেখালেন। হট্‌হাউসে আম ও লিচুর গাছ আছে; তাতে দুচারটী ফলও ফলে রয়েছে দেখা গেল। এদেশে আম লিচুর গাছ সচরাচর হয় না। অন্য দুএকটী ভারতীয় গাছও

হটহাউসে আছে। পরে এঁদের জাপানি বাগানটী দেখ্লাম। জাপানি বাগানের কথা অনেকেই শুনেছেন এবং তার ছবিও দেখেছেন কিন্তু চোখে না দেখ্লে তার সৌন্দর্য্য অনুভব করা শক্ত। ছোট-ছোট গাছগুলির মধ্য দিয়ে সেই রকম ছোট-ছোট ষ্ট্রীম্, তার উপরে আবার শাঁকো। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! এমন সুন্দর বাগান আমি কখনও দেখিনি। ঐ ছোট গাছেই ফুল ফুটেছে তা'ও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। মার্কুইসের ড্রইং ও ডাইনিং রুম দেখলাম। সেগুলি সব বিলাতি ধরণে সাজান।

সেখান থেকে মিঃ সোয়েজিমা আমাদের সঙ্গে মোটরে এলেন এবং তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়ি যেতেই তাঁর স্ত্রী এসে দরজা খুলে আমার কোটটী রেখে দিলেন। এঁদের বাড়িটা কিন্তু একেবারে জাপানি ধরণের। এঁরা আমাদের সকলকে একটী ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা নিচু টেবিলের চারিধারে গোল জাপানি আসন পাতা ছিল; মিঃ সোয়েজিমা ও মিঃ সাকুরাই ও আমরা সকলেই সেই টেবিলের চারিধারে বস্লাম। মিঃ সাকুরাই রিকৃশ করে আমাদের পিছনে এসেছিলেন। মিসেস্ সোয়েজিমা কিন্তু আমাদের সঙ্গে বস্লেন না। তিনি অন্য ঘর থেকে পিয়ালায় করে বিলাতি ধরণের চা এনে আমাদের সকলকে দিলেন এবং তার সঙ্গে এঁদের দেশের একরকম মিষ্টান্নও পরিবেশন কর্লেন। সেটা কিন্তু খেতে মন্দ নয়, দেখ্তে অনেকটা জেলির মত। মিসেস্ সোয়েজিমা সেখানে বসলেন না বা খেলেন না; ইনি ইংরাজি ভাষা বল্তে পারেন না। খাওয়ার পর মিঃ সোয়েজিমা আমাদের তাঁর ঘর দেখাবার জন্য উপরে নিয়ে গেলেন। আগেই বলেছি বাড়িটা একেবারে জাপানি ধরণের, উপরে দুটী ছোট-ছোট ঘর আছে। সেগুলি তাঁর নিজের পড়্বার ঘর। নিচেও ঘরগুলি দেখলাম বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রান্নাঘর পর্য্যন্ত দেখ্লাম। ঘরের

মেজেতে মাদুর পাতা। বারাণ্ডাগুলি সরু বটে কিন্তু তার কাঠগুলি খুব ঝক্‌ঝকে। এরাই আরামে থাক্‌তে জানে। সামান্য ছোট খাট বাড়িগুলির ঘর দোর কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জাপানি জাতটাই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; তবে এদের খাওয়া ও রাস্তা-ঘাট দেখ্‌লে এই বিশ্বাস একটু শিথিল হয়। ঘরগুলি দেখে আমরা আবার সেই টেবিলের কাছে গিয়ে বস্‌লাম। সেখানে অল্পক্ষণ বস্‌বার পর মিসেস্‌ সোয়েজিমা আমাদের জন্য ভার্‌মিচেলির মত একটা খাদ্য জিনিস এক-একটা বাটীতে করে এনে দিলেন। তার সঙ্গে এক রকম সস্‌ও মিশিয়ে খাবার জন্য দিলেন। আমার কিন্তু সে খাদ্যটী পছন্দ মত লাগ্‌ল না। তার পর তিনি কিছু "বিয়ুয়া" অর্থাৎ লকেট্‌ ফল খেতে দিলেন। এ ফলটী আমাদের দেশে যেমন হয় তার চেয়ে এখানে বড় বড় হয় এবং তাতে খুব রস ও মিষ্ট স্বাদ থাকে। এ সময় এই ফল জাপানে খুব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছিল। খাওয়া সমাপ্ত হলেও কিন্তু গৃহপত্নী আমাদের সঙ্গে এসে একবার বসলেন না। বোধ হয় ইংরিজি জানেন না, সেজন্য কথা বল্‌তে পারবেন না বলেই বস্‌লেন না। এঁদের তিনটী কন্যা আছে। বড়টী Women's University (নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে) পড়ে। কিন্তু এঁদের ছেলে নাই বলে বড় মনে কষ্ট বল্লেন। আমাদের দেশের মত ছেলে না হলে এঁরাও বড় দুঃখিত হন। এ সবের পর আমরা হোটেলে ফির্‌লাম। আমাদের ফির্‌তে দেড়্‌টা বাজ্‌লো এবং আমাদের মোটর ভাড়া ১৫ ইয়েন অর্থাৎ ১৭৲ টাকা লাগ্‌ল। বিকেলে মিসেস্‌ কেব্‌রেরার মা মিসেস্‌ Duer আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করে ছিলেন কিন্তু খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সে জন্য আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে যেতে পার্‌লাম না।

প্যাসেঞ্জ্ সমস্যা

১৭ই জুন—

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার হলো। উনি জাপান গভর্ণমেণ্টের কৃষি অফিসে গিয়ে কৃষিকার্য্যের বিষয় দেখার একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে এলেন। কৃষিবিভাগের সেক্রেটারীর নাম মিঃ ইসিগুরো। রবিবারে তাঁকে একটা গ্রাম দেখাতে নিয়ে যাবেন ঠিক হলো। প্যাসেজের কোন খবর পাওয়া যায়নি। টোকিওতে বসে সে খবর পাবার যো নাই কারণ জাহাজ কোম্পানির অফিস কোবে ও ইয়োকোহামা ছাড়া আর কোথায়ও নাই। এ দুটী জায়গা হলো এদের বন্দর। এখানেই সব বিদেশী দোকান ইত্যাদি আছে। তাই কোবে ও ইয়োকোহামাতে গেলে অনেক বিদেশীর মুখ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কিয়োটো ও টোকিওতে জাপানি ছাড়া অন্য জাতি খুব কম দেখা যায়। সেখানে সবই জাপানি, চারদিকেই জাপানি মুখ, জাপানি দোকান ইত্যাদি। সে জন্য প্যাসেজই হোক্, নিজেদের কাপড় চোপড়ই হোক্, সবের জন্য হয় কোবে বা ইয়োকোহামাতে যেতে হয়। আমাদের এই দুই জিনিসেরই দরকার ছিল সে জন্য আমার স্বামী কৃষি অফিস থেকে ফিরে আস্তেই আমাদের ইয়োকোহামা যাবার কথা স্থির হলো। ১২টায় লাঞ্চ খেয়েই আমরা বেরুলাম। খেতে যাবার আগে দেখা গিয়েছিল যে ওঁর ছাতা পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ ওঁর মনে হলো যে উনি সকালে যে রিকৃশ করে এসেছিলেন, তাতেই ভুলে ফেলে রেখেছেন, নাম্বার সময় সেটা নামান হয়নি। তাই ঠিক হলো যে, যে ষ্টাণ্ড্ থেকে উনি রিকৃশ ভাড়া নিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে খোঁজ

করতে হবে। ইয়োকোহামা যেতে ষ্টেসনে যাবার রাস্তায় সেই ষ্টাণ্ডটা পাওয়া যাবে। দুচার পা যেতে না যেতে সেই সকালের রিক্‌শওয়ালা সেই হারাণ ছাতাটা নিয়ে এসে হাজির হলো। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, এদের দেশে চুরি যে খুব কদাচিৎ হয় তা এই রিক্‌শওয়ালার ব্যবহারে বোঝা গেল। এমন সৎ গাড়িওয়ালা আমাদের দেশে খুব দুর্লভ। গাড়ির মধ্যে ছাতা ফেলে এলে অনেক ক্ষেত্রেই ত তার আর পাত্তাই পাওয়া যায় না, আর গেলেও আমাদের দেশে অমন কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক খুব কমই আছে যে নিজে কষ্ট করে এসে ছাতাটা পৌঁছে দিয়ে যায়! তার সৎস্বভাবের জন্য রিক্‌শওয়ালাকে উপযুক্ত বকৃশিস্ দিয়ে উনি বিদায় দিলেন।

আমরা ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণের ষ্টেসনে এসে পৌঁছতে আমার স্বামী সেখানে Tourist Guide (বিদেশীয়দের পথ নিদর্শন করবার জন্য এঁরা আছেন) এর সাহায্য নিলেন। গাইড্ আমাদের টিকিট কেনার সাহায্য করলেন। টিকিট-কেরাণা ছিল একজন জাপানী স্ত্রীলোক। জাপানে আজকাল অনেক জায়গায় মহিলারা কেরাণীর কাজ করছে দেখা গেল। আশ্চর্য্য এই যে এই মহিলা কেরাণীটী যদিও ইংরাজি ভাষা জানে না, তবু কেমন নিপুণতার সহিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা কোথাকার টিকিট চাই বলে দিতেই কেরাণী মেয়েটী টিকিটগুলি আমাদের জন্য দিলেন। আমাদের দেশের টিকিট-কেরাণীবাবুরা টিকিট দিলেই তাঁদের কাজ সমাপ্ত হল ভাবেন, কিন্তু এখানকার ব্যবহার অন্য রকম দেখলাম। কোন্ দিকে ইয়োকেহামার ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণ পাওয়া যায় তা আমরা ঠিক জানতাম না। তাই এই কেরাণী-মহিলাটী নিজের টিকিটের ঘর থেকে বাইরে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এসে তা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। রেলের টিকিট-কেরাণী যে এ রকম ভদ্র হতে পারে, তা না দেখ্‌লে বিশ্বাস হতো না। আমাদের দেশের রেল-কর্ম্মচারীরা বিদেশী যাত্রীদের এমন

ভাবে কখনো সাহায্য করেছেন বলে শুনি-নি। বরঞ্চ বিদেশীদের নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ পর্য্যন্ত করতে দেখেছি। এখানেই আমাদের উপর জাপানিদের ভদ্রতা শেষ হলো না। প্লাটফর্ম্মে যখন আমরা ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন একটি জাপানি ভদ্রলোক এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন ও কোন্ ট্রেণে যেতে হবে সব বলে দিলেন। বল্লেন, তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। আমরা ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেণে উঠলাম। এগুলি ঠিক অন্য ট্রেণেরই মত, কেবল গাড়ির সংখ্যা কম থাকে, এবং ট্রাম গাড়ির মতো বিদ্যুতের জোরে চলে। ইয়োকোহামা পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগ্‌ল। আমরা রিক্‌শ ভাড়া করে সোজা পি এণ্ড ও কোম্পানির আফিসে গেলাম। আমাদের বোম্বাই থেকে প্যাসেজ্ পাওয়ার খবর এসেছে কি না খোঁজ নেওয়া হল। কোম্পানির লোক বল্লে, নাগাৎ সোমবার খবর পাওয়া যাবে। আমরা ইয়াকোহামা থেকে সিলোন দিয়ে ইংলণ্ড যাবার প্যাসেজ্ পাওয়া যাবে কি না তারও খোঁজ নিলাম। তারা বল্লে, সব বুক্ করা হয়ে গেছে, কোথাও জায়গা নেই। তার পরে আরো পাঁচ-ছটা জাহাজের আফিসে গিয়ে সন্ধান করা গেল, সব জায়গাতেই একই কথা—জায়গা নাই। একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার নজরে পড়্‌ল, যে সব অফিসে জাপানি কর্ম্মচারী ছিল, তাদের সবাই বেশ হেসে হেসে ভদ্রতার সঙ্গে বল্লে "জায়গা নাই"। কিন্তু যে তিনটে অফিসে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ছিল, তাদের কি মেজাজ! আচ্ছা বাপু, প্যাসেজ্ দিতে পারবে না তাই বল্লেই হয়, কিন্তু তা না বলে কথায় কথায় তারা মেজাজ দেখায়। জাপানি ও বিলাতি ভদ্রতার তফাৎ এই খানেই। যা হোক্ সব আফিস ঘোরা গেল। বাকি রইল কেবল N. Y. K. ("নিপন্ ইউসেন্ কেইসা") ও কানেডিয়ান প্যাসিফিক্ কোম্পানির অফিস্। সে দুটা জায়গায় খোঁজ করতে গেলাম।

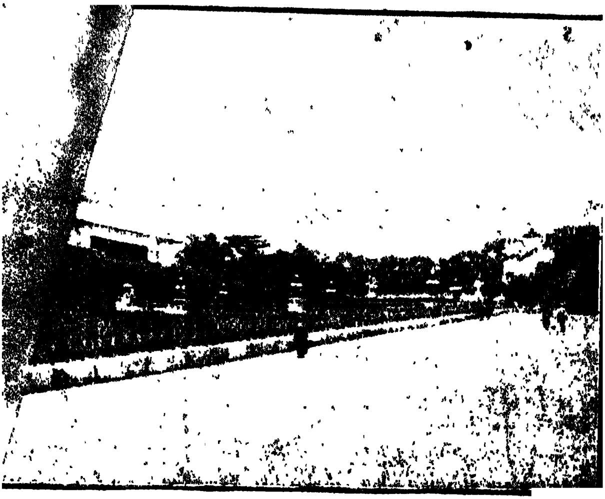
নিপন্ ইউসেন্ কেইশাদের জিজ্ঞাসা করতেই দু'জন জাপানি হাসতে লাগল এবং জিজ্ঞাসা করলে আমরা কবে এবং কোথায় যেতে চাই। আমরা জানালাম, যত শীঘ্র সম্ভব আমেরিকা হয়ে হোক বা সোজা সুয়েজ হয়েই হোক্ ইংলণ্ডে যেতে চাই। লোকটা অন্য একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে, শেষে বল্লে "কামো মারু" জাহাজে ওরা বোধ হয় জায়গা দিতে পারবে। তবে এখনো ঠিক বলতে পারে না। জাহাজ কবে ছাড়বে জিজ্ঞাসা করা গেল। তারা বল্লে, ২০শে জুন। জানা গেল জাহাজে তা'রা তিনটে "বার্থ" দিতে পারবে না। দুটো 'বার্থ' এবং একটা সোফাওয়ালা ক্যাবিন পাওয়া যাবে। এই সব শুনে ত আমাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তখন তখন প্যাসেজ্ বাবদ্ এক হাজার আট শত ইয়েন তাদের কাছে দাখিল করা গেল। প্যাসেজ্ বুক্ হয়ে গেল। পাস্ পোর্টে আমেরিকা হয়ে যাবার কথা লেখা ছিল; সুতরাং তাব একটু পরিবর্ত্তন দরকার। পাস্ পোর্টের এই পরিবর্ত্তন হলেই, ওরা টিকেট দেবে বল্লে। বাঁচা গেল; প্যাসেজের জন্য বড়ই ভাবনা ছিল। মনটা খুব খুসী হ'ল। আমরা ছ'টার সময় টোকিয়োতে ফিরলাম। সবাই বলতে লাগল, নিপন্ ইউসেন কোম্পানির জাহাজগুলো খুব ভাল, আমরা বেশ আরামে যাব।

১৮ই জুন—

আজ সকালে আমার স্বামী মিঃ সোয়েজিমার আফিসে তাঁর সঙ্গে সব জায়গা দেখবার বন্দোবস্ত করতে গেলেন। সাড়ে বারোটায় ব্রিটিশ এম্ব্যাসেডারের বাড়িতে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ আছে। তাই তিনি ফিরলে দু'টো রিক্‌শ করে আমরা বেরুলাম। ব্রিটিশ রাজদূতের নাম সার্ চার্লস্ ইলিয়ট্। তাঁর আফিসের সামনেই একজন ইংরেজের সঙ্গে দেখা হ'ল।

সে আমাদের সার্ চার্লসের বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিল। তার পরে বাড়ির আরেকজন ইংরেজ আমাদের "ড্রইং রুমে" নিয়ে গেল। সেখানে সার্ চালর্সের ভাই, ভাইএর স্ত্রী ও আরো অনেকগুলো ইংরেজ মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে অলোপ হ'ল। তার পরে আমরা সকলেই "ডাইনিং রুমে" লাঞ্চ্ খেতে গেলাম। সার্ চার্লসের একদিকে আমি এবং অন্য দিকে তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী বসলেন। টেবিলের সব জিনিষই গিল্টি করা, ফুলদানি, নুন্দানি, অন্য যা রূপার জিনিষ ছিল, সে গুলোকেও সোণার মতো দেখাচ্ছিল। জাপানি চাকর জাপানি কাপড় পরে পরিবেশন করলে। এখানকার হোটেলের চাকররা কিন্তু কোট্ পাজামা পরে পরিবেশন করে। সার্ চার্লস্ বল্লেন, তিনি ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন এবং লর্ড রোণালড্সেকে তিনি জানেন। তাঁর ভাই এবং ভাইয়ের স্ত্রী কাল "পি এণ্ড্ ও" কোম্পানির জাহাজে সুয়েজ হয়ে বিলাত যাচ্ছেন। আমরা ৯ই জুলাই নিপ্পন্ ইউসেন্ এর জাহাজে যাত্রা করছি শুনে তাঁরা আমাদের হিংসা করতে লাগলেন। কারণ এদের জাহাজে অনেক আরাম পাওয়া যায়। লাঞ্চের পরে আমরা ড্রয়িং রুমে এলাম। সার্ চার্লসের ভাই ও তাঁর স্ত্রী বেশ লোক। তাঁরা বল্লেন ইংলণ্ডে যদি আবার দেখা হয়, তা হ'লে তাঁরা খুসী হবেন। লাঞ্চের পরে অল্পক্ষণ গল্প-গুজব করে আমরা চলে এলাম। সেখান থেকে ড্রেশ্লারদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কালই তাঁদের সঙ্গে মিউজিয়াম্ দেখ্তে যাবার কথা ছিল, কিন্তু ইয়াকোহামা গিয়েছিলাম বলে, যাওয়া হয় নি। কিন্তু ড্রেশ্লারদের দেখা পাওয়া গেল না। তার পরে মিসেস্ কোমোরোদের বাড়ীতে চা খেয়ে আমরা ছটার সময়ে হোটেলে ফিরলাম। মিসেস কোমোরো বেশ ইংরেজি বলতে পারেন। তাঁদের ওখানে অনেকগুলি ইংরেজ ও জাপানি মহিলার সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

স্বামী "ফরেন্ আফিসের" সেক্রেটারির সঙ্গে
'এম্বেসেডার্ সেক্রেটারিকে লিখে দিয়েছিলেন,
নগুলি আমাদের দেখান হয়। সেক্রেটারি



দুর্গের মধ্যে জাপান সম্রাটের প্রাসাদ

পানি, তিনি বল্লেন তিনি আমাদের দেখা শুনার জন্যে আগেই সব
বস্থা করে রেখেছেন। আমি আর বেরুলাম না। কেবল বিকেলে
ক্যানেলের ধারে বেড়াতে গেলাম। টোকিয়ো সহরের মাঝ দিয়ে ক্যানেল
গিয়েছে, ক্যানেলের ওপারেই সমুদ্র। আজ সমস্ত দিন বৃষ্টি হয়েছে।
বিকেলটায় আকাশ পরিষ্কার ছিল।

জাপানের পল্লীজী

২০শে জুন—

আজ সকালে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই বেরুলাম না। আমার কৃষিবিভাগের সেক্রেটারি এবং আরো দুই তিন জন কৃষি-ক দশ মাইল দূরের একটা জাপানি গ্রাম দেখ্‌তে গেলেন।

তাঁরা সকলে মোটর করে এসে আমার স্বামীকে নিয়ে যে ব্রেকফাষ্টের পরে মিঃ মজুমদার এলেন। তিনি আমাকে এবং আ ছেলেকে কোন খানে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলেন, আমরা গেলাম ন ইয়াকোহামাতে কোন ভাল সাড়ি কেনবার জন্যে তাঁকে বলেছিলা তিনি সাড়ি পান্ নি; কেবল পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বহরের দুই থান্ রেশ এনেছিলেন। ছয়টার সময় আমার স্বামী ফিরে এলেন। তাঁর কাছে শুনলাম আমাদের দেশের চাষাদের চেয়ে এদেশের চাষারা সব রকমে উন্নত। তিনি গ্রামে এবং মাঠে যা দেখেছিলেন তা নিজেই এখানে লিখে দিয়েছেন :—

"মিঃ টোডাটস্থ ইসিগুরো হচ্ছেন্ খাস জাপান গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও কৃষিবিভাগের সেক্রেটারি। ইনি বিলাত বেড়িয়ে এসেছেন এবং খুব শিক্ষিত। বিজ্ঞ বলে তাঁর খ্যাতি আছে; ইংরেজি বেশ ভালই বলতে পারেন। তিনিই আমার এই দেখাশুনার ব্যবস্থা করে দিলেন। কৃষি-সমিতির ইন্‌জিনিয়ার মিঃ সোনাদার সঙ্গে ব্যবস্থা করে ইনি সকালে আটটায় এক মোটর নিয়ে আমাদের হোটেলে এলেন। তার সঙ্গে মিঃ ক্যাটো এলেন। ইনিও কৃষি বিভাগের একজন কর্ম্মচারী। যা হোক মিঃ ইসিগুরো, মিঃ সোনাদা, মিঃ ক্যাটো এবং আমি, এই চারজনে মোটর করে

বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় যেতে অনেক ময়লার গাড়ি দেখা গেল। মুখবন্ধ কাঠের বড় বড় বাল্‌তিতে রাশি রাশি ময়লা ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই হয়ে গ্রাম থেকে সহরের দিকে আসছে—জমির সারের জন্যে। এই সারের রীতিমতো বেচা কেনা চলে। জাপানের রাস্তা ঘাটে এই রকম ময়লার গাড়ি প্রায়ই দেখা যায়। এরা একটুও ময়লা নষ্ট হতে দেয় না, সার করে। সব সহরেরই ময়লা প্রতিদিন অথবা প্রতি সপ্তাহে গ্রামে গ্রামে এবং ক্ষেতে ক্ষেতে পাঠানো হয়। এতে যদিও রাস্তা ঘাটে ময়লার গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু জমির ফসল যে কত বৃদ্ধি পায় তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমরা (Kamazawa Horticultural) কামাজাওয়া হর্টিকলচরাল্ স্কুলের কাছে যেতেই ড্রাইভার আমাদের মোটরখানাকে এত জোরে চালাতে আরম্ভ করলে যে, একখানা ঘোড়ায় টানা মালের গাড়ির পাশ কাটিয়ে চল্‌তে গিয়ে মোটরের একখানা চাকা নর্দ্দমায় পড়ে গিয়ে সেখানকার কাদায় আট্‌কে গেল। এদের রাস্তাঘাট বড় খারাপ, রাস্তার পাথর বসায় কিন্তু সেগুলিকে রোলার দিয়ে বা দুরমুস্ করে বসায় না। এই রাস্তার পাশে বাঁশের সুন্দর কুঞ্জ আছে। জাপানিরা যে রকম সুন্দর করে বাঁশের আবাদ করে তা' আমাদের শেখা উচিত। এক একটা বাঁশ আলাদা থাকে, এক সঙ্গে কতগুলো বাঁশের ঝাড় হতে দেয় না। গাড়ির চাকা নর্দ্দমায় পড়ে যাওয়ায় আমরা অগত্যা আধ মাইল দূরের ঐ হর্টিকলচার্ স্কুলটা দেখ্‌তে গেলাম। রবিবার বলে' সে দিন স্কুলে ছাত্র ছিল না। কিন্তু উদ্ভিদ্-তত্ত্ব ও ফলের বাগান তৈয়ার করার শিক্ষার বন্দোবস্ত সেখানে অতি সুন্দর। প্রকাণ্ড বাগান, তাতে অনেক ফলের গাছ রয়েছে। জাপানের প্রত্যেক বিভাগে এই রকম এক একটা স্কুল আছে। যারা কৃষি-বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চায়; তারা মধ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে এই সব বিদ্যালয়ে এসে উদ্ভিদ্-তত্ত্ব ও কৃষি শিখে যায়। ঘণ্টা-খানেক পরে আমাদের

মোটরের চাকা তোলা হ'ল এবং আর আধ ঘণ্টা পরে আমরা টামাগাওয়া (Tamagawa) গ্রামে পৌঁছলাম। 'গাওয়া" মানে নদী। গ্রামখানি নদীর ধারে আছে বলে, তার নাম হয়েছে টামাগাওয়া। গ্রামে এসেই আমরা গ্রামের আফিসে গেলাম। সেখানে গ্রামের Headman অর্থাৎ মোড়ল এবং গ্রাম্য কৃষিসমিতির সেক্রেটারি এবং কো-ওপারেটিভ সমিতির সম্পাদক আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমরা জুতো খুলে ঘরের মেজেতে বসলাম। সেখানে আমাদের জাপানি চা খাওয়ান হ'ল। তা'র পরে আমি গ্রামের বিষয় প্রশ্ন করতে লাগলাম্; গ্রামের মোড়ল এবং কৃষি সমিতির সেক্রেটারি তার উত্তর দিতে লাগলেন। উত্তর জাপানি ভাষায় দেওয়া হ'ল; তাই মিঃ ইসিগুরো তার তরজমা আমাকে শুনাতে লাগলেন। সব প্রশ্ন শেষ হ'লে এরা আমাকে জাপানি লাঞ্চ্ খাওয়ালেন। তারপর তাঁদের গ্রাম্য আফিসের ও কৃষিসমিতির রেজিষ্টারে আমার নাম সই নিয়ে রাখা হ'ল। এখন আমরা সকলে গ্রামের ফসলের এবং সারের ভাণ্ডার দেখতে গেলাম। এটা কো-ওপারেটিভ ভাণ্ডার। নীচেতে তক্তার পাটাতন, তক্তার দেওয়ালওয়ালা ঘর, ধান চাল তাতে খড়ের তৈয়ারি গোলায় রাখা হয়েছে ও বেশ ভাল অবস্থায় আছে। জাপানে ধান চালের জন্য বস্তা ব্যবহার নেই। ধানের খড় দিয়ে তৈয়ারি বওয়ারই ব্যবহার সর্ব্বত্র। ভাণ্ডার দেখে আমরা গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখ্‌তে গেলাম। আমাদের দেশের কলেজের মত একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ীই এই স্কুল। তার সঙ্গে আবার একটা প্রকাণ্ড কৃষিক্ষেত্রও আছে। এই বাড়ী গ্রামের মোড়লরা নিজের টাকা দিয়ে তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে রাস্তার নাম ইত্যাদির এক একটা সাইনবোর্ড আছে। তা ছাড়া গ্রামের মাঝে একটা সাইনবোর্ডে গ্রামের নক্সা আঁকা রয়েছে। এই সব সাইনবোর্ড ও নক্সা করেছেন গ্রামের যুবক-

সমিতি। প্রত্যেক গ্রামেই এক একটা যুবক-সমিতি আছে, এর দ্বারা দেশের অনেক উন্নতি হচ্ছে। তারপর আমরা কয়েক জন মিলে একজন



খড়ের বস্তায় ধান বাঁধা

কৃষকের বাড়ী দেখ্‌তে গেলাম। বাড়িগুলি বেশ পরিপাটি, ও

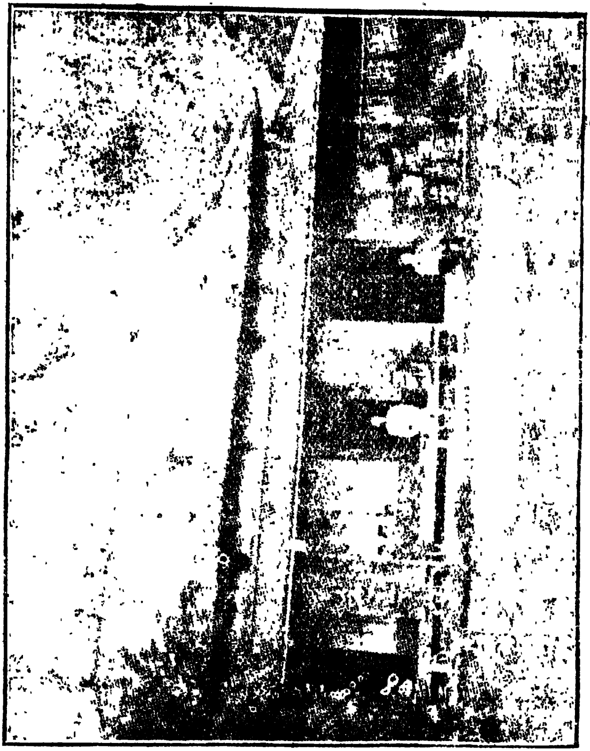
পরিচ্ছন্ন। ঘরের ভিতরটা মাদুরে ঢাকা, কোন আবর্জ্জনা নেই। এরা মানুষের ময়লা ক্ষেতে দেবে বলে বাড়িতেই জমিয়ে রাখে। এর জন্যে বাড়িতে বড় দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। বাড়িতে একটা পায়খানা থাকে।



জাপানের কৃষক

সপ্তাহে দুবার সেটা পরিষ্কার করে; সব ময়লা আর একটা ঘরের ভিতরকার প্রকাণ্ড গর্ত্তে ঢেলে রাখে। সে ঘরের কাছে ময়লার দুর্গন্ধে যাওয়া যায় না। জাপানিদের নাকে কিন্তু সেটা লাগে না, তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। জমি চাষ করার পরে ঐ সব জমানো ময়লা মুখবন্ধ বালতিতে করে গাড়িতে চালিয়ে ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তরিতরকারিকে শীতের শেষে আবাদ করবার নূতন প্রণালী কৃষি-সমিতির সেক্রেটারি চাষাদের শিখিয়েছেন। কৃষকদের বাড়ীতে গ্লাসের ছাদওয়ালা লম্বা লম্বা ঘর আছে। তাতেই শীতের শেষে তরিতরকারি

আবাদ করা হয়। অল্প জমি থেকে বেশি ফসল আদায় করার প্রথা জাপানিরা খুবই জানে। বাড়ির সীমানার ভিতরে তারা একহাত জমি ফেলে রাখে না। সব জায়গাতে কিছু-না-কিছু ফসল আছেই।



কৃষকের ঘর

গাছের তলার জমিও এরা ফেলে রাখে না। সেখানে অন্য ফসল হয় না বলে রঙ্গিন ফুল অথবা রঙ্গিন পাতার গাছ লাগায় এবং এই

ফুল-পাতা সহরে বিক্রি করে। কোন জমি ফেলে রাখা হয়না বলে, কৃষকদের বাড়ির কোনো জায়গায় জঙ্গল বা আবর্জ্জনা দেখা যায় না। Economy of space অর্থাৎ স্থানের অনপচয়ের জন্যে বছরে বছরে কৃষি বিভাগ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

"এই সব দেখা হলে আমরা সেক্রেটারির বাড়ীতে গেলাম। তিনি চা খাওয়ালেন। দেখলাম তাঁর নিজের একটা ছোটো সাবান তৈয়ারির কারখানা আছে। তা'ছাড়া তাঁর বাড়িতেই কো-অপারেটিভ সোসাইটির একটা ভাণ্ডার আছে। তিনি নিজে সেখানে কেনা বেচা করেন। দেখলাম, ছোটো ছোটো কাগজে জিনিষের দাম লিথোগ্রাফ করে ছাপিয়ে রাখা হয়েছে। এখান থেকে হেঁটে আমরা গ্রামের বাহিরে এক কৃষিক্ষেত্রে গেলাম। এখানে ঘোড়ায় টানা লাঙ্গলে জমি চষা হচ্ছে। এই গ্রামে চাষের গরু নেই। চাষের জন্যে সব জায়গায় গরু ব্যবহার করা হয় না। ঘোড়া দিয়ে চষা জমি গুলিতে কৃষকরা লোহার rake দিয়ে নিজের হাতে কাদা করছে। সওয়া শিমের (soya bean) গাছ ও শিমের খোসা সেই কাদার সঙ্গে মিশানো হচ্ছে দেখা গেল। এই সবুজ সারে (green manure) জমি ভাল হয়। জল সেচনের ব্যবস্থাও সুন্দর। পাঁচ-ছয় মাইল দূরে উঁচুতে যে নদী আছে সেখান থেকে নালা করে জল আনা হয়েছে। কতকগুলি নালা দিয়ে সেই জল প্রত্যেক ক্ষেতে যাচ্ছে। কাজ হয়ে গেলে এই জলই আবার তার নীচের আর কতকগুলি নালা দিয়ে নীচের গ্রামগুলিতে যাচ্ছে। মাঠে ক্ষেতগুলি অতি সুন্দর ভাবে সাজানো আছে। কোন ক্ষেতের আইল বাঁকা নেই। এতে যে কেবল মাঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তা নয়, ভাল সেচনের ও সুবিধা হয়! দেখলাম ক্ষেতে যাবার জন্য রাস্তাও আছে। এই সব রাস্তায় ঠেলা গাড়ি কোরে সার বীজ ইত্যাদি অনায়াসে ক্ষেতে আনা যায়।

"এখান থেকে আমরা টামাগাওয়া নদীতে নেবে বিশ্রাম করলাম। সেটা অনেকটা বীরভূমের দাঁড়কা নদীর মত। নদীর বেশীর ভাগই বালি ও ছোটো নুড়ি পাথরে ভরা। এই পাথরগুলো টোকিও প্রভৃতি



ফসলের মাঠ

সহরে চালান দেওয়া হয়। বিশ্রামের পরে আমরা নদীর ঘাটে গেলাম। সেখানে অনেক টি-হাউস আছে। মোড়ল মহাশয় সেখানে আমাদের সরবৎ ও ফল ইত্যাদি খাওয়ালেন। টোকিয়োর লোক এখানে এসে বাচ্ খেলে এবং মাছ ধরে শুনা গেল।"

নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২১ই জুন—

আজ সকালে আমরা মেয়েদের উচ্চ নর্ম্মাল স্কুল ও টেকনিকাল স্কুল দেখ্‌তে গেলাম। সেখানে মিঃ মজুমদার ও মিঃ সাকুরাই ছিলেন। তা'ছাড়া মিঃ অটল নামে কানপুরবাসী এক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ভারত গবর্ণমেণ্ট এঁকে জাপানে পাঠিয়েছেন, এবং তাঁর বদলে একজন জাপানি অধ্যাপক ভারতে গিয়েছেন। উচ্চ নর্ম্মাল স্কুলে যাবা মাত্রই মিঃ মজুমদার স্কুলের ইংরাজি শিক্ষয়িত্রী মিস্ এবিহাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনি আমাদের জাপানি-চা খাইয়ে সব স্কুলটা দেখালেন। এখানে ছাত্রীর সংখ্যা তুই হাজার এবং শিক্ষকের সংখ্যা এক-শত আশী। বৎসরে এক লাখ ত্রিশ হাজার ইয়েন খরচ হয়। চার বৎসর থেকে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েরা প্রাথমিক বিভাগে পড়ে। বয়স্ক মেয়েরা মিড্‌ল হাই স্কুল এবং হাই স্কুলে পড়ে। সব বিভাগই এই স্কুলের আছে। অর্থাৎ চার বৎসর থেকে ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পড়বার ব্যবস্থা এখানে আছে। স্কুল দেখে দেখে আমরা একটা বসবার ঘরে এলাম। সেখানে ডিরেক্টরের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল। আমার স্বামী শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। শুন্‌লাম খুব ছোটো মেয়েদের বই পড়ানো হয় না—তারা কাদা দিয়ে পুতুল তৈয়ারি করে, ছবি আঁকে এবং গান শেখে। তাদের আঁকা ছবি দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে,—দেখলে বিশ্বাস হয় না যে সেগুলো ছোটো মেয়েদের আঁকা। স্কুলের বাড়িটাও প্রকাণ্ড, খুব বড় হাতা। এই

স্কুল দেখে আমরা মেয়েদের টেক্‌নিকাল স্কুল অর্থাৎ শিল্প বিদ্যালয়ে দেখতে গেলাম। এটাও বড় আশ্চর্য্য স্কুল। দেখ্‌লাম এখানে সাধারণ লেখা পড়ার সঙ্গে সুঁচের কাজ, ফুল সাজানো, রান্না, কাপড় ধোওয়া রঙ্‌ করা, ছবি আঁকা ইত্যাদি অনেক হাতের কাজও শিখানো হচ্ছে। রান্না শেখানোটা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল; কাপড় ধোওয়া ও রঙ্গ



সেলাইএর ক্লাস

করার কাজ দেখলাম। মেয়েরা সাধারণতঃ নিজের কাপড়েই সুঁচের কাজ শেখে, কেবল বৎসরে একবার করে প্রত্যেক মেয়েকে স্কুল থেকে কাপড় দেওয়া হয়। সেলাই শেষ হলে সেগুলিকে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়। জাপানের মহারাণী বৎসরে একবার করে এখানে এসে অনেক জিনিস কিনে নিয়ে যান। একটা ঘরে মেয়েদের তৈয়ারি অনেক জিনিষ ছিল আমরা তিনটা ছোট ব্যাগ্‌ কিনে হোটেলে ফিরলাম। এখানেও প্রায় ১৬০০ (ষোল শত) মেয়ে পড়ে।

২২শে জুন—

সকালে উঠেই আমার স্বামী ওয়াসিদা (Waseda) বিশ্ব-বিদ্যালয় দেখতে গেলেন। আমি বাড়িতেই রইলাম। রাত্রিতে কৃষিবিভাগের সেক্রেটারি মিঃ ইসিগুরো ও অন্য দু'জন কৃষি কর্ম্মচারীকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁরা সন্ধ্যার পরে এলেন। আমার স্বামী তাঁদের সঙ্গে কৃষি সম্বন্ধে নানা আলোচনা করতে লাগলেন। এক কৃষীয় মহিলার সঙ্গে আমার সেদিন হঠাৎ আলাপ হয়েছিল, আমি তাঁর সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম।

২৩শে জুন—

আজ সকালে আমরা Women's University অর্থাৎ মহিলাদের বিশ্ববিদ্যালয় দেখ্‌তে গেলাম। পথের মাঝে Mens Higher Technical স্কুল অর্থাৎ পুরুষদের উচ্চ শিল্প বিদ্যালয় ছিল, প্রথমে সেটা দেখে নেওয়া গেল। সেখানে মিঃ সিং নামে এক কাশ্মিরী ছাত্র ছিলেন, তিনি যত্ন করে আমাদের স্কুলটা দেখালেন। বেশি সময় ছিল না। সে জন্য সব দেখার সুবিধা হ'ল না। কাপড় বোনার কলের তাঁত, পেনসিল ও পোর্স্‌লেন্‌ তৈয়ারির প্রণালী তিনি বিশেষ ভাবে আমাদের দেখালেন। তিনি কাশ্মীর থেকে মাটি এনে, সেই মাটি দিয়ে চীনে বাসন তৈয়ার করা শিখ্‌চেন। লোকটি কিন্তু বেশ ভদ্র; খুব যত্ন করে আমাদের সব দেখালেন।

আমরা Women's Uuiversityতে (মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়) যেতেই একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী শিক্ষক আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। এঁরা এখানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেন। তাঁরা ইংরেজি কাপড় পরেছিলেন। শুনলাম, চার বৎসর আমেরিকায় থেকে তাঁরা ইংরেজি শিখে এসেছেন। এখানে কিণ্ডারগার্টেনের ক্লাশ থেকে আরম্ভ



ফুল সাজানোর ক্লাস



কাপড় রং করার ক্লাস

করে হাই স্কুলের ক্লাশ পর্য্যন্ত সব ক্লাশই আছে। তার পরে আবার ইউনিভার্সিটি ক্লাশও আছে। অন্য মেয়ে-স্কুলের মত এখানে সব বিষয়েই শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এটা কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় নয়, লোকে চাঁদা তুলে এর প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা ইউনিভারসিটির অনেকগুলি ক্লাশ দেখলাম। তা'র পরে আমাদের একটা বড় ঘরে নিয়ে বসানো হ'ল; সেখানে আমরা চা ও মেয়েদের তৈয়ারি কেক্ খেলাম। এখানে প্রায় এক হাজার মেয়ে পড়ে। তাদের থাকবার ঘর গুলাও দেখলাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। মেয়েরা নিজেরাই খাওয়া দাওয়ার দেখাশুনা করে, চাকর বাকরদের কাজও তারা করে। এতে শিক্ষা কম হয়না।

আমরা সব দেখে শুনে যখন মোটরে উঠ্‌তে যাচ্ছি এমন সময়ে দেখা গেল, কতকগুলি মেয়ে নাচের মত ড্রিল্‌ করছে। দু'জন করে সারি দিয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে পা ফেল্‌চে। এদেশের লোক যেমন মেয়েদের শিক্ষার উপরে নজর দেয়, তেমনি তাদের শারীরিক উন্নতির দিকেও নজর রাখে। এদের মেয়েদের স্কুলের জীবনটা বড়ই আনন্দের। আমাদের দেশে এরকমটি কবে হবে, দেখলে কেবল তাই মনে হয়।

বিকেলে অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। মিঃ মজুমদার এলেন। আমরা চায়ের পরে কাছেই একটা Boys' Technical School (বালকদের শিল্প বিদ্যালয়) দেখতে গেলাম। যেখানকার বুড়ো ডিরেক্টর খুব ভালো লোক; খুব যত্ন করে তিনি আমাদের স্কুল দেখালেন। আমরা সেখানকার পাঠ্য কয়েক খানা বই নিয়ে এলাম। এখানে এক দল ছেলে দিনে অন্য কাজ করে' রাত্রিতেও হাতের কাজ শিখে। আমার স্বামী দু'জন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি কাজ করে। একজন বল্লে দিনে খবরের কাগজ বিক্রি করে, রাত্রিতে ইলেকট্রিক ইন্‌জিনিয়ারিং শিখচে;

আর একজন ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে ; সে দিনে বাপকে সাহায্য করে, রাত্রিতে এখানে স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করে। স্কুল দেখে আমরা হোটেলে ফিরলাম।

২৪শে জুন—

আজ আর বিশেষ কাজকর্ম্ম ছিল না। আমার স্বামী কৃষি-কলেজ দেখ্‌তে গেলেন, আমি বেরুলাম না। কিছু জিনিষপত্র কেনার ছিল, আজ সেই কাজটাই করা গেল।



টোকিওর একটি পার্ক

২৫শে জুন—

আজ সকালে আমার স্বামী আবার কৃষি-কলেজ দেখতে গেলেন। কাছেই একটা হাঁসপাতাল ছিল। আমি সেটা দেখে এলাম। আমার স্বামী ফিরে এলে সকলে আড়াইটার সময়ে মিসেস্ ডিওয়ার (Duer)এর বাড়িতে চা খেতে গেলাম। যেতে আধ ঘণ্টা লাগ্‌ল। গিয়ে দেখি

আমাদের মতোই একজন জাপানি মেয়ে চা খেতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। মিস্ হুয়ার শোগুনদের সমাধিগুলো দেখাতে আমাদের শিবা পার্কে নিয়ে গেলেন। সমাধিক্ষেত্র কাছেই ছিল, তাই হেঁটেই যাওয়া হল। দেখলাম সমাধির ভিতরগুলোতে গালার কাজ করা আছে, দেখতে বেশ সুন্দর। ডিওয়ারদের বাড়িতে ফিরে দেখি অনেকগুলো সম্ভ্রান্ত জাপানি স্ত্রীলোক একত্র হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ব্যারোনেস্ মেগাতা, তাঁর মেয়ে মিসেস তাকাতা ও মিসেস্ সাওদা নামক আর একটি মহিলা ছিলেন। মিঃ সাওদা একজন ক্রোড়পতি। তা' ছাড়া ভূতপূর্ব্ব কন্সাল-জেনারেল্এর স্ত্রী মিসেস নুমানো, ব্যারোনেস্ সেঙ্গ্ ও তাঁর মেয়ে মিসেস কিতাকোজি ইত্যাদি অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা এসেছিলেন। এঁরা সকলেই বেশ ইংরেজি বলেন। ব্যারোনেস্ মেগাতা বেশ রসিক মহিলা। তাঁর সঙ্গে খুব আলাপ হ'ল। সকলেই আমার কাপড়ের প্রশংসা করলেন। মিসেস্ কেব্রেরা তাঁর বোন মিস্ ডিউয়ারকে একখানা সাড়ি দিয়েছিলেন। সেই সাড়িখানা ব্যারোনেস্ মেগাতা পরে এলেন, তাঁকে বড় মজার দেখাচ্ছিল। আমরা চা, কেক্ ও জাপানি খাবারও খেলাম। একটা ভাত ও তরকারি দিয়ে তৈয়ারি জিনিস আমাদের খেতে দেওয়া হল, কিন্তু সেটা ভাল লাগল না। তবে চালের গুড়ো দিয়ে নিম্কির মতো যে একটা খাবার ছিল সেটা বেশ লাগল। সন্ধ্যার সময়ে সকলকে নমস্কার করে আমরা বিদায় নিলাম। পথের মাঝে একজন চেকো-স্লভোয়িক মহিলার বাড়িতে গেলাম, ইনি আমাদের হোটেলে ছিলেন, তাই আগেই আলাপ ছিল। বাড়ি ফিরতে প্রায় আটটা হ'ল। এসে দেখলাম মিঃ মজুমদার আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে আছেন।

২৬শে জুন—

আজ সকালেই আমরা ইয়োকোহামা গেলাম। কিছু কেনবার ছিল,

তাই দোকানে দোকানে ঘুরতে হ'ল। অনেকগুলি জাপানি ব্রকেডের স্যাণ্ডেল (চটিজুতো) কিনলাম; এক সেট চা'য়ের বাসনের অর্ডার দিয়ে এলাম। আমার স্বামী টাকার জন্যে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন, তিনি মিঃ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন। মিঃ মজুমদার আমাদের একজন পার্শির কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে রেশমের সাড়ি ছিল, আমরা অনেকগুলো সাড়ি কিনলাম। রাত্রে মিঃ সাকুরাই এবং সোয়াজিমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হ'ল। ষ্টেশনে মিসেস ড্রেস্‌লারের সঙ্গে দেখা হ'ল, তারা 'নাইল্' জাহাজে কাল রওনা হবেন শুনলাম।

কামাকুরা ও নিক্কো

২৮শে জুন—

সকালটা মেঘ করে আছে এবং অল্প অল্প বৃষ্টিও হচ্ছে। তবুও আমরা সমুদ্রের তীরে 'কামাকুরা নামে একটা জায়গা দেখবার জন্যে বার হলাম। মিঃ মজুমদার আমাদের সব দেখাবেন ব্যবস্থা ছিল, তিনি পথের মাঝে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইলেকট্রিক্ ট্রেনে যেতে হয়। কামাকুরা পৌঁছতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগ্‌ল। একটা ফিটান্ গাড়ি ভাড়া করে সেখানে যে বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে, প্রথমে তাই দেখতে গেলাম। নারাতে যে মূর্ত্তি দেখেছিলাম, এটা তারই মত বড়। মূর্ত্তিটা ব্রঞ্জের এবং ভিতরটা ফাঁপা। সেই ফাঁপা জায়গায় আবার দুই তিনটা বুদ্ধের ছোটো ছোটো মূর্ত্তি রাখা হয়েছে। দেখলাম সেখানে অনেক জাপানি তীর্থ করতে এসেছে। বুদ্ধের বড় মূর্ত্তির ভিতরে ছোট মূর্ত্তিগুলো রাখা ভাল হয়নি। এতে মূর্ত্তিকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হয় না। মন্দির থেকে কাছের একটা হোটেল দেখে, আমরা সমুদ্রের ধারটা দেখতে গেলাম। এখন আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। আমরা জুতা-মোজা খুলে জলে পা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বেড়ালাম। আমার স্বামী ত মিঃ মজুমদারের সঙ্গে দৌড়ের রেস্ আরম্ভ করলেন। সুন্দর জায়গা! এখানে সমুদ্র-স্নানের জন্যে ঘরও আছে। অনেকক্ষণ বেড়িয়ে আমরা হোটেলে এসে লাঞ্চ্ খেয়ে একটু বিশ্রাম করলাম। কামাকুরা থেকে একটু দূরে এনোসিমা নামে একটা দ্বীপ আছে। সেটা দেখতে যাবার জন্যে আমরা এখন প্রস্তুত হলাম। ট্রামের রাস্তা; আধ ঘণ্টা সময় লাগ্‌ল। যখন ট্রাম থেকে নামলাম তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই একটা টি-হাউসে বসে

একটু বিশ্রাম করতে হ'ল। তার পরে দ্বীপের রাস্তায় বেরুলাম। দেখলাম রাস্তার দু'ধারে দোকানে ঝিনুকের নানা রকম জিনিষ বিক্রি হচ্ছে। হঠাৎ দেখ্‌লে সেগুলোকে সুন্দর মনে হয়, কিন্তু আসলে জিনিষগুলা নিতান্ত খেলো। ঝিনুক দিয়ে মাছ তৈয়ারি করে বিক্রি করা হচ্ছিল, সেগুলো কিন্তু বড় সুন্দর। আমরা তারই দুটো কিনব মনে করলাম। ডাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের মাঝের দ্বীপ পর্য্যন্ত একটা কাঠের পোল আছে। লম্বায় সেটা আধ মাইলেরও উপরে। আমরা তারই উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলাম। যাবার আগে টিকেট



কামাকুরার বুদ্ধ মূর্ত্তি

কিনতে হ'ল। এই দ্বীপটার দৃশ্য খুব ভালো বলে চারিদিকে খ্যাতি আছে। কাগজে পত্রেও তার ছবি দেখা যায়। তাই অনেক লোকে দ্বীপ দেখতে আসে। আজ বর্ষার দিনেও অনেক লোক এসেছে দেখ্‌লাম। দ্বীপে পৌঁছেও দেখলাম সেখানে অনেক ঝিনুকের দোকান রয়েছে।

এনোসিমা দ্বীপের একটা অতি প্রাচীন গুহা আছে। ইহা একটা ঐতিহাসিক বস্তু। বড় বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই আমাদের আর গুহা দেখা হ'ল না। আমরা দু'চারটা ঝিনুকের জিনিব কিনে, তাড়াতাড়ি টোকিয়োতে ফিরে এলাম। ফিরতে আটটা বেজে গেল।

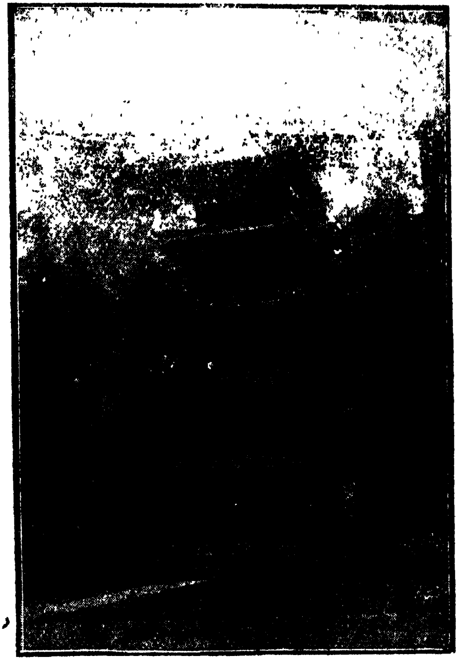
২৮শে জুন—

আজ সকালে আর বেরুলাম না। সমস্ত দিন ধরে জিনিষ-পত্র প্যাকিং করলাম। আমার স্বামী মিঃ ইসিগুরোর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। দু' একটা জিনিষ কিনবার জন্যে বিকেলে বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় মিঃ মজুমদার এলেন। তিনি "গিন্‌জা" নামে টোকিয়োর বিখ্যাত বাজারটা দেখাতে নিয়ে গেলেন। এই বাজারের রাস্তার ফুটপাথে বাক্সওয়ালারা নানা রকমের জিনিষ নিয়ে বসে। জাপানিরা সন্ধ্যার আগে ডিনার খেয়ে এখানে কেনা-বেচা করতে আসে। রাত্রিতে খুব ভিড় হয়।

২৯শে জুন—

জিনিষপত্র সব হোটেলে রেখে ফের কয়েকটা সুটকেস্ নিয়ে আমরা আজ সকালে নিক্কোতে গেলাম। পৌঁছিতে প্রায় দেড়টা বাজলো। নিক্কো হোটেল থেকে লোক এসেছিল ; তারা আমাদের বাক্স নিলে। আমরা মোটর করে হোটেলে এলাম। নিক্কো জায়গাটা টোকিয়ো থেকে দু'হাজার ফিট উঁচু, কিন্তু সে রকম ঠাণ্ডা নয়। এখানে অনেক Cryptomaria গাছ আছে। গাছগুলি দেখতে অতি সুন্দর। হোটেলের উপর তলায় আমরা একটা ঘর পেলাম। হোটেলটা কিন্তু বেশ। মুখ ধুয়ে লাঞ্চ খেয়ে এখানকার মন্দির ও শোগুনদের সমাধি দেখতে বার হওয়া গেল। মন্দির ও সমাধির জন্য নিক্কো সহরটা বিখ্যাত। খানিকটা সিঁড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠতেই একটা প্যাগোডা নজরে পড়ল। প্যাগোডায় লাল গালার কাজ করা আছে, এবং অনেক ফুল, পাখী, জন্তু ইত্যাদি

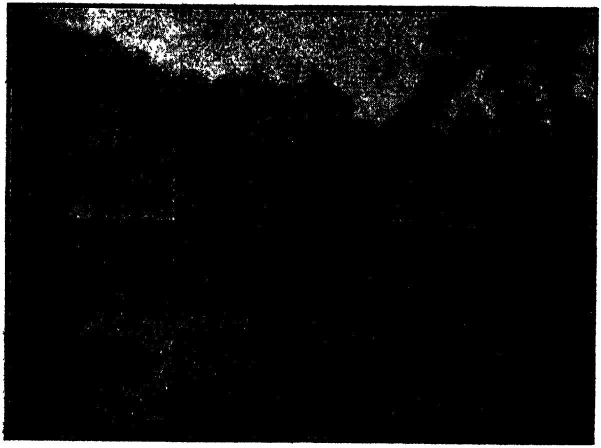
খোদা আছে দেখতে বড় সুন্দর। এখানে আমরা টিকেট্ কিনলাম। এই টিকেট নিক্কোর সব মন্দির, সমাধি ও মিউজিয়ম দেখা যায়। সিঁড়ি দিয়ে আরো কতক দূর উপরে উঠে সামনেই একটা ফটক দেখা গেল। সেটাকে লোকে "All day gate" অর্থাৎ "সমস্ত দিনের ফট্‌ক" বলে। অর্থাৎ ফট্‌কটা এমন সুন্দর, যে সমস্ত দিন হাঁ করে তাকিয়ে থাকিলেও দেখার সাধ মেটে না। আমরা হোটেল থেকে একজন গাইড্ এনেছিলাম। সে আমাদের সব দেখালে। যা হোক গেট্‌টা এমন আশ্চর্য্য কিছু নয়, তবে সুন্দর বটে। গালার তৈয়ারি নানা রকম ফুল ও পাখী তাতে খোদা আছে। চারিদিকে কাঠের পাঁচিল আছে.



নিক্কো প্যাগোডা

সেটাতেই খোদাই কাজ রয়েছে! তার উপর দিকে ফুল, গাছ, পাখী ইত্যাদি আঁকা আছে নীচের দিকে জল ও বক ইত্যাদি জলচর পাখীর ছবি আছে এই ফটক দিয়ে সম্রাট ও পুরোহিত ছাড়া আর কেহই

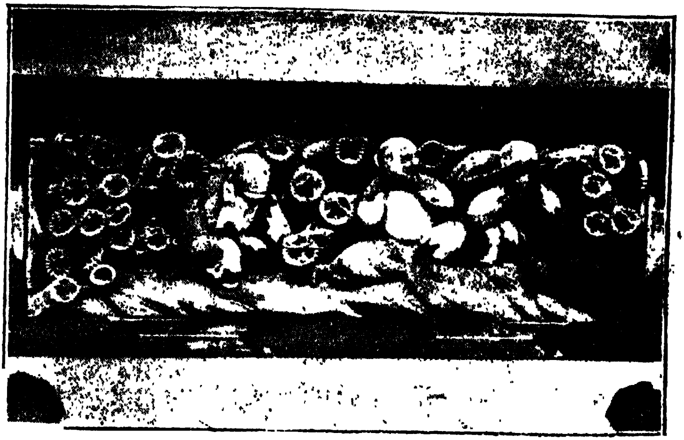
ভিতরে যেতে পারে না। তাই আমরা একটা ছোট ফটক দিয়ে, ভিতরে গেলাম। গাইড কাপড়ের জুতো সঙ্গে এনেছিল। আমরা চামড়ার জুতো ছেড়ে সেই জুতো পায়ে দিলাম। সাধারণ জুতো পায়ে দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা এ পর্য্যন্ত অনেক মন্দির ও সমাধি দেখেছি, এখানে যা দেখলাম তা বাস্তবিকই সুন্দর। ছবি, খোদাই কাজ এবং লাল ও সোণালি রঙের যে সব গালার কাজ আছে সে রকমটি অন্য জায়গায় সত্যই দেখিনি। মন্দিরের ভিতরটা দেখে বাইরের



নিক্কোর হোটেল

একটা ঘরে গেলাম। এখানে খুব দামি কিমোনো সাজানো রয়েছে। এগুলি বৎসরে একবার পুরোহিতেরা পরে শোভাযাত্রায় বার হন্। এই ঘরের দরজার উপরে একটা বিড়ালের ছবি কাঠে খোদা দেখ্‌লাম। বিড়ালটার নাম "Sleeping cat" অর্থাৎ ঘুমন্ত বিড়াল। লোকে বলে এই বিড়ালের ছবি আছে বলে মন্দিরে ইঁদুর থাকতে পারে না!

দ্বিতীয় শোগুনের ঘোড়ার আস্তাবলের উপর তিনটি ছবি খোদাই করা আছে। শুন্‌লাম এগুলির একটা কোরিয়া থেকে, দ্বিতীয়টা চীন থেকে এবং তৃতীয়টা ভারতবর্ষ থেকে আনা হয়েছে। কোরিয়া ও চীনের



তিন বুদ্ধিমান বানর

ছবিতে একটা করে বানর আছে, কিন্তু যেটা ভারতবর্ষ থেকে আনা হয়েছে, সেঠায় তিনটা বানর খোদা আছে। একটা বানর কাণ বন্ধ করে আছে, অন্যটা মুখ বন্ধ করে রয়েছে এবং শেষের বানরটা চোখ বন্ধ করে বসে আছে। ভারতের এই তিনটি বানরকে "The three wise monkeys" অর্থাৎ তিন বুদ্ধিমান বানর বলা হয়। যে মুখ বন্ধ করে সে বলছে "Dont speak evil" অর্থাৎ মন্দ কথা বলোনা; যে কান বন্ধ করে আছে সে বলছে "Don't hear evil" অর্থাৎ মন্দ কথা শুনোনা। যে চোখ বন্ধ করে আছে সে বলছে "Don't see evil" অর্থাৎ কোন মন্দ ব্যাপার দেখো না। এই সব দেখতে শুনতে

চারটা বেজে গেল। চারটার পরেই মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, তাই আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে, নিক্কোর বাজারটা দেখ্‌তে গেলাম। দেখলাম সেখানে অনেক রকম গালার কাজের জিনিষ ও কাঠের জিনিষ বিক্রি হচ্ছে। আমরা কয়েকটা পিতলের বুদ্ধ, ঘণ্টা বজ্র ইত্যাদি কিন্‌লাম। তা'ছাড়া গালার কাজের ফ্রেম-সুদ্ধ জাপানি ছবি এবং কতকগুলা চায়ের পেয়ালা পিরিচও কেনা গেল।

৩০শে জুন—

নিকটেই পাহাড়ের উপরে একটা হ্রদ আছে শুনে তাই দেখবার জন্যে আমরা সাড়ে দশটার সময় বেরুলাম। ট্রামে আধ ঘণ্টা খানেক যেতে হল, তারপরে রিক্‌শা করে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। রাস্তাটা বড় খারাপ, তাই মাঝে মাঝে গাড়ি হতে নামতে হচ্ছিল; কুলিরা টানতে পারছিল না। রাস্তার অনেক জায়গায় ঝরণা দেখা গেল; খুব জোরে জল ছুটে চলেছে। এই সব ঝরণার উপরে পোল আছে; তারি উপর দিয়ে যেতে হয়। সমস্ত রাস্তাটার দৃশ্য অতি চমৎকার। মাঝামাঝি একটা টি-হাউসে থেমে একটু বিশ্রাম করলাম। কুলিদের জলখাবার পয়সা দেওয়া হল। তারা চা ও অন্য খাবার খেলে। আমরা রাস্তায় Kegan fall নামে একটা জল-প্রপাত দেখ্‌লাম। সেটা বড় বটে কিন্তু আমাদের দেশে তার চেয়ে অনেক বড় জল-প্রপাত দেখেছি। বেলা দশটার সময়ে আমরা চুজেনজি হোটেলে পৌঁছলাম, এখানেই হ্রদ আছে। আজ দিনটা বেশ পরিষ্কার, তাই হ্রদের দৃশ্যটাও চমৎকার মনে হল। নিক্কো হোটেল থেকে কুপন্ দিয়েছিল, সেই কুপন দেখিয়ে আমরা লাঞ্চ্ খেলাম। তার পরে শ্যামপান্ নিয়ে আমরা প্রায় দেড় ঘণ্টা হ্রদে বেড়ালাম। শামপানে মাদুর পাতা থাকে, তার উপরে বেশ আরামে বসে বেড়ানো গেল। দিনটা বেশ আনন্দেই কাটলো।

প্রায় চারটার সময় আবার রিকশাতে নেমে ট্রাম করে হোটেলে এলাম।

১লা জুলাই—

আজ ব্রেক্‌ফাষ্ট খেয়ে এবং আমাদের সেই গাইড্‌কে সঙ্গে নিয়ে বাকি মন্দির ও সমাধি গুলা দেখতে গেলাম। প্রথমে পরশু যে প্যাগোডা দেখা গিয়েছিল তারই ছবি তোলা হ'ল। তার পরে আমরা মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। সেখানে অনেক পুরানো জাপানি জিনিষ আছে। শোগুনদের পোষাক, তাদের খাবার বাসন, কাপড় রাখবার বাক্স ইত্যাদি অনেক জিনিষ দেখা গেল। দেখলাম সেখানে মোম দিয়ে তৈয়ারি জাপানি পুরুষ ও মেয়েদের মূর্ত্তি আছে। মিউজিয়ম থেকে আমরা দুইটি মন্দির ও সমাধি দেখতে গেলাম। সে দিন শোগুনদের যেমন সমাধি ইত্যাদি দেখেছিলাম, এ গুলিও ঠিক্ সেই রকমেরই। দুই তিন শত ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠলে পাহাড়ের উপরে এই সমাধি গুলি দেখা যায়। অনেক জাপনি মেয়ে ও পুরুষ ছোটো ছেলে মেয়েদের পিঠে ঝুলিয়ে এখানে পূজা দিতে এসেছে দেখলাম। আমাদের দেশের মেয়েদের মতো জাপানি মেয়েরা ধর্ম্ম-প্রবণ। তবে আমাদের দেশের মেয়েরা যেমন অনাহারে এবং উপবাসে শরীর পাত করেন এরা তা করে না। জাতিভেদ না থাকায় প্রত্যেক টি-হাউসে যাত্রীরা প্রয়োজন মত খাবার খেয়ে নেয়। এতে যাত্রাদের কষ্ট হয় না। শুনলাম, এখানকারই একটা ছোটো পাহাড়ে নদীর ধারে একখানা পাথরে সংস্কৃততে অনেক কথা খোদা আছে। আমার স্বামা সেটা দেখবার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমরা খুবই ক্লান্ত ছিলাম তথাপি সেটা দেখতে যাওয়া ঠিক হোল। হোটেল থেকে সে জায়গাটা প্রায় কুড়ি মিনিটের রাস্তা। বার হওয়া গেল এবং নদীর জলের স্রোতে চাকা ঘুরিয়ে গৃহস্থেরা সংসারের যে

সব কাজ করে নেয় তাও ফাঁকতালে দেখা হয়ে গেল। দেখলাম একটি গৃহস্থের বাড়ির এক পাশে একটা কাঠের প্রকাণ্ড চাকা আছে। তারি উপরে ঝরণা বা পাহাড়ে নদীর জল পড়ে চাকাটাকে অনবরত ঘুরাচ্ছে। চাকার সঙ্গে ধান ভানার কাঠের কল জোড়া আছে। তাই যেমন চাকা ঘুর্‌ছে, অমনি কলটাও আপনা-অপনি ঘুরে ধান ভেনে চাল তৈয়ার কর্‌ছে। আমরা সেই গৃহস্থটির ঘরের ভিতরে গিয়ে ধান-ভানা দেখ্‌লাম,—লোক নেই, কল্‌টা আপনিই কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশের পাহাড়ে জায়গায় এরকম ছোটো নদী ও ঝরণার অভাব নেই। লোকে এরকম চাকা ঘুরিয়ে কাজ আদায় করে নেয় না কেন জানি না। এই সব দেখে আমরা কাঠের পুলের উপর দিয়ে নদীর ওপারে গেলাম। খানিক দূরে যেতেই দেখা গেল, অনেকগুলা বুদ্ধের মূর্ত্তি সারি সারি নদীর ধারে বসান আছে। এ গুলির সংখ্যা বোধ করি গুণেই শেষ করা যায় না। আগে নাকি আরো মূর্ত্তি ছিল, সেগুলি এখন নদীর গর্ভে ভেঙ্গে পড়েছে। নদীর ধারে যে পাথরটায় সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে, সেটা দেখা গেল। আমার স্বামী লেখাটা পড়্‌লেন। গাইড্‌ আমাদের বল্লে, লোকে এখানে এসে কোনো কামনা করে একটা পাথর বুদ্ধের কোলের দিকে ফেলে। যদি পাথরখানা ঠিক কোলে গিয়ে পড়ে, তবে কামনা সিদ্ধ হয়। সব দেখে শুনে আমরা বারটার পরে হোটেলে পৌঁছলাম। তার পরে লাঞ্চের পরে ষ্টেশনে এসে সাড়ে পাঁচটায় আবার টোকিয়োতে পৌঁছলাম। হোটেলে গিয়ে দেখা গেল, আমরা যে ঘরে থাকতাম সেই ঘরগুলাই আমাদের জন্য আছে। বাঁচা গেল।

২রা জুলাই—

আজ সকালে আমার স্বামী মিঃ ভৌমিকের সঙ্গে কৃষি-বিদ্যালয় দেখতে গেলেন। আমি চিঠিপত্র লেখার কাজগুলো সেরে নিলাম।

স্বামী ফিরে এলে বেলা চারটায় ইম্পিরিয়াল থিয়েটার দেখতে গেলাম। এ পর্য্যন্ত জাপানি থিয়েটার দেখা হয়নি। মিঃ মজুমদার আগেই আমাদের জন্যে টিকেট কিনে রেখে-ছিলেন। তিনি আসতে একটু দেরী করেছিলেন। তা যা হোক্, নির্দ্দিষ্ট জায়-গায় বসবা মাত্রই বাজনা বাজ্‌তে লাগ্‌ল। বাজনাটা ইংরেজি ব্যাণ্ডের ধরণের; ঠিক ইংরেজি কেতায় ষ্টেজের সামনে বাজাচ্ছে। বসবার জায়গাও ঠিক ইংরেজি ধরণের। অভিনয়টা যেন



জলে ঘুরাণো চাকা

আমাদের বাংলা থিয়েটারের মতো। খুব চেঁচিয়ে ও টেনে টেনে কথা বলে অভিনয় করলে। প্রোগ্রামটা ইংরেজিতে ছিল, তাই অভিনয়ের ব্যাপারটা অনুমান করে নেওয়া গেল। মিঃ সাকুরাই সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইংরেজি জ্ঞান এত কম যে, তিনি বিষয়টা বোঝাতে পারলেন না। এদের থিয়েটারের সিন্‌গুলো ওঠা-নামা করে না; শুধু সামনের

ড্রপ্ সিন্‌টা উঠে নামে, ভিতরের সিন্ ঘুরে ঘুরে বদ্‌লে যায়। এটা কিন্তু আমাদের ভালো লাগ্‌লো না; ভারি অস্বাভাবিক ঠেক্‌ল। অভিনয়ের বিষয় ছিল তিনটে,—প্রথমটা জাপানি প্রাচীন ঐতিহাসিক একটা গল্প—দ্বিতীয়টা একটা আধুনিক সামাজিক গল্প; তৃতীয়টা যেন একটা প্রহসনের মতো। আন্দাজে বুঝলাম কি করে সাকি মদের উৎপত্তি হয়েছিল, তাই ব্যঙ্গচ্ছলে এতে দেখান হচ্ছে। পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত থিয়েটার হল। থিয়েটারের বাড়িতেই ডিনার খাওয়া গেল। সেখানে দেখলাম যেন বাজার বসে গেছে, সব জিনিষই পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের দেশের বাজারের মতো একটুও গোলমাল নেই,—সব চুপ্-চাপ্। বাড়ি ফিরতে এগারটা বেজে গেল। থিয়েটারে ইংরেজী কায়দা দেখে খুসী হতে পারলাম না,—খাঁটি জাপানি থিয়েটার দেখবার জন্য বড় আগ্রহ হতে লাগ্‌ল।

৩রা জুলাই—

আজ সকালে আমার স্বামী মিঃ ভৌমিকের সঙ্গে নাকানো নামে এক জায়গায় একটি কৃষিবিদ্যালয় দেখ্‌তে গেলেন। তিনি দেখে এসে বল্লেন, "এই স্কুলটি এখানকার A Class কৃষি বিদ্যালয়। নাকানোতে ইলেক্‌ট্রিক্ রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ষ্টেশন হতে স্কুল একশত গজেরই মধ্যে। সেখানে এক শত ছেলে ও এক শত মেয়ে পড়ে। ছেলে ও মেয়েদের পড়ার ঘর পৃথক্। এরা সকলেই প্রাথমিক স্কুলের পড়া শেষ করে এসেছে, কাজেই বয়স চৌদ্দের কম নয়, বরং বেশিই আছে! এখানে তিন বৎসর পড়া হয়। শিক্ষার ব্যবস্থা অতি আশ্চর্য্য ও সুন্দর। স্কুলের হাতায় দুই বিঘা আন্দাজ কৃষিক্ষেত্র আছে। তা'তে ধান, গম ইত্যাদি ফসলের এবং পিয়ার ফলের আবাদ করা হচ্ছে। ছেলে মেয়েরা নিজের



সারিবদ্ধ বুদ্ধ মূর্ত্তি



জাপানী থিয়েটারের অভিনয়

হাতে এর চাষ করে। আমাকে দেখাবার জন্য সব ছেলেমেয়েকে কৃষিক্ষেত্রে পাঠানো হল। তারা কোদাল, বিদে ইত্যাদি কৃষিকার্য্যের যন্ত্র নিয়ে কাজ দেখাতে লাগ্‌ল। দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে গেল। খড়কাটার যন্ত্র দিয়ে খড় কাটতে লাগ্‌ল, একটা বাঁশের কল ঘুরিয়ে গমের গাছ থেকে গম ছাড়াতে লাগ্‌ল, ক্ষেত থেকে গোল আলু তুলে সেগুলিকে



নাকানো কৃষি বিদ্যালয়

ওজন করে ক্ষেতের ফসল ঠিক্ করতে লাগল। আমাকে কিছু শিম ও শশা উপহার দিলে। এখানে ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক কেমিষ্ট্রিও শেখে। সুন্দর ল্যাবোরেটারি ও মিউজিয়ম্ রয়েছে। মিউজিয়মে সব রকমের জিনিষ, এমন কি গ্রামোফোন ও দুর্ব্বীণ ইত্যাদিও আছে। এগুলিরও গঠন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েরা কৃষিকার্য্য ছাড়া সেলাই, রান্না, কাপড় ধোওয়া ইত্যাদিও শিক্ষা করে। স্কুলের একটা ঘরে মাদুর পাতা দেখলাম। এটা তাদের ব্যায়ামাগার। এখানে জিউ-যুৎসু শিক্ষা

দেওয়া হয়। ছোটো ছেলেরা বেশ জিউ-যুৎসু শিখেছে দেখ্‌লাম। তারা আমাকে অনেক কসরৎ দেখালে।

লাঞ্চ্‌ খাওয়া হলে আমরা কিছু জিনিষপত্র প্যাক্‌ করলাম। কাল সকালে আমরা টোকিয়ো ছেড়ে ইয়োকোহামাতে যাব। ৯ই জুলাই আমাদের জাহাজ ছাড়্‌বে। তাই দুই-তিন দিন ইয়োকোহামাতে থাকব এবং জিনিষ-পত্র সেখানে রেখে মিয়ানোসিতা ও হাকোনি দেখতে যাব ঠিক হল। বিকালে ডিউয়ারদের এবং রাইস্‌মেনদের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। মিঃ ভৌমিককে আজ রাত্রে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। তিনি ডিনারে এলেন।

হাকোনি

৪ঠা জুলাই—

সকালে সব বন্ধ করে, ব্রেক্‌ফাষ্ট খেয়ে আমরা বেরুলাম। মিঃ মজুমদার এসেছিলেন, তাঁকেও খেতে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সব জিনিষপত্র hand cart অর্থাৎ ঠেলা গাড়ি করে ষ্টেশনে পাঠানো হল। এখানে গরুর গাড়ি বা অন্য গাড়ি নেই। তাই মালপত্র নিয়ে যাবার এটাই সহজ উপায়। আমার স্বামী ও মিঃ মজুমদার সব মালপত্র বুক্‌ করে দিলেন। আমরা বারোটায় ইয়োকোহামায় পৌঁছলাম। ঠিক্‌ ছিল, দু'টা সুটকেস্‌ এবং দু'চারটা ছোটো বাক্স নিয়ে আমরা মিয়ানোসিতা যাব। কিন্তু থাক্‌বার জায়গা ত চাই, তাই আগেই বেলমণ্ট হোটেলে গিয়ে একটা ঘর ঠিক করে রাখা হ'ল। তারপরে লাঞ্চ খেয়ে ষ্টেশনে এসে গাড়িতে উঠ্‌লাম। মিঃ মজুমদার আমাদের সঙ্গে কোজু ষ্টেশন পর্য্যন্ত এলেন। সেখানে মোটরবাস্‌ পাওয়া গেল। তাতে চড়ে দুই তিন মাইল যাবার পরে বাস্‌ পাহাড়ে উঠতে লাগল। দৃশ্য অতি চমৎকার! নীচেই সমুদ্র, পাশে গাছপালা ও পাহাড়। কিন্তু রাস্তাটা খারাপ। দু'খানা মোটর অতি কষ্টে পাশাপাশি যেতে পারে। আমরা প্রায় দু'টায় মিয়ানোসিতায় পৌঁছলাম, আমাদের মোটর সেখানের হোটেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। এই হোটেলের সুখ্যাতির কথা আগে শুনেছিলাম, লোকে বলে এসিয়ার মধ্যে এটাই সব চেয়ে ভাল হোটেল। আমরা নেমেই হোটেলে থাকবার জন্যে একটা ঘর ঠিক কর্‌লাম। ভাড়া চাইলে প্রতিদিন চল্লিশ ইয়েন। আমরা রাস্তা

কাটিয়ে পরদিন সকালেই চলে যাব, তাই এ ভাড়াতেই ঘরটা নিলাম। শুন্‌লাম, এই হোটেলে একশো লোকের থাকবার ব্যবস্থা আছে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে হোটেলের সব দেখ্‌লাম। খুব বড় ড্রয়িং রুম ও লাইব্রেরি আছে। লাইব্রেরি আজ আর দেখা হল না। নাচ-ঘরে উঁকি মেরে দেখি, কয়েক জন ইংরেজ মেয়ে ও পুরুষ নাচ্‌ছে; তা ছাড়া তাদের মধ্যে একজন জাপানি মেয়েও নাচ্‌ছে। শুন্‌লাম এই মেয়েটি হোটেলের স্বত্বাধিকারীর কন্যা। খুব সুন্দরী বলে এর সমস্ত জাপানে সুনাম আছে। কিন্তু তেমন সুন্দরী বলে বোধ হ'ল না, হয় ত এককালে সুন্দরী ছিল।

৫ই জুলাই—

আজ সকালে লাইব্রেরি দেখ্‌লাম। সেখানে বিক্রির জন্য অনেক জিনিষ রেখেছে—যেমন কাঠের বাক্স, কিমোনো, ব্যাগ্ ইত্যাদি। কেমন করে জিনিষপত্র বিক্রি করতে হয় তা জাপানিরা বিলক্ষণ জানে। আমরা কিছু জিনিষ কিন্‌লাম্। তার পরে সাঁতার দেবার জায়গা (Swimming bath) ও হোটেলের বাগানটা দেখ্‌লাম। বাগানটা অতি সুন্দর। এগারোটার সময় আমরা মোটরবাস্ করে হাকোনি হ্রদ ও ফুজি পাহাড় দেখবার জন্যে বার হলাম। বাস্‌টা খুব ছোটো ছিল, দেড় ঘণ্টায় হাকোনি পৌঁছান গেল। কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা, ফুজি পাহাড় দেখা গেল না। আমাদের দেশে হিমালয় পাহাড় যেমন প্রসিদ্ধ এবং তার সঙ্গে যেমন অনেক প্রবাদ ও কিম্বদন্তী জড়ানো আছে, জাপানের ফুজি পাহাড়ও ঠিক তাই। জাপানিরা এই পাহাড়কে দেশের গৌরব বলে মনে করে। কোনো নতুন জায়গায় গেলেই আগে থাক্‌বার জায়গা ঠিক করা দরকার হয়। আমরা হাকোনিতে একটা হোটেলে উঠ্‌লাম। এটা ছোটো এবং সম্পূর্ণ জাপানি ধরণের। আসবাব পত্র ও ঘর-দোর কিছুই ভাল নয়।

কিন্তু হোটেলটা ঠিক হ্রদের উপরে বলে দৃশ্যটা সুন্দর। কিন্তু শুধু দৃশ্যে আরাম পাওয়া যায় না, তাই আমার স্বামী আর একটা হোটেল ঠিক করলেন। এখানকার হোটেলের দেনা-পাওয়া চুকিয়ে আমরা সেই হোটেলে গেলাম। কিন্তু এই হোটেলটাও প্রায় আগেকার মত, কেবল ঘরগুলো একটু ভালো। যা' হোক কোন গতিকে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করা গেল। কিন্তু হাকোনি দেখবার কোন উপায় ছিল না;—আকাশ জোড়া মেঘ এবং ঝড়ের মতো হওয়াতে সব মতলব নষ্ট করে দিলে। তাই অগত্যা হোটেলেই দিনটা কাটাতে হল।

৬ই জুলাই—

সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘে ও কুয়াসায় ঢাকা। ভারি বিশ্রী লাগল। রাস্তায় কাদা; বেড়াতে বেরিয়ে বেশী দূর যাওয়া গেল না। কিন্তু ফুজি পাহাড় দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না, আর একটা দিন এখানে কাটাতে হল। বিকেলেও আকাশ পরিষ্কার হল না। খবর পাওয়া গেল আমাদের জাহাজ ৯ই জুলাই ছাড়বে না, ১৬ই রওনা হবে। বই পড়ে শেলাই করে কোন রকম দিনটা কাটানো গেল।

৭ই জুলাই—

আজও সকালে মেঘ করে আছে। সুতরাং ফুজি দেখবার আশা এক রকম ত্যাগই করা গেল। ইয়োকোহামাতে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করলাম। ফিরতে ছ'টা বেজে গেল। সেখানে একটা টেক্সিতে জিনিষ-পত্র বোঝাই দিয়ে বেলমণ্ট হোটেলে এলাম। তেতালায় আমরা দু'টা ঘর পেলাম। বেশ ঘর, একটাতে খুব হাওয়া খেলে।

ইয়োকোহামা

৮ই জুলাই—

আজ সকালে পুরুষোত্তমদাসদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। পথের মাঝে এক ভারতবাসীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি সিন্ধু দেশের লোক, নাম মিঃ হাস্‌রাজানি। তিনি আমাদের তাঁদের বাড়ীতে থাকবার জন্যে খুব জিদ্ করলেন, কিন্তু আমরা রাজি হলাম না। যা হোক এখন মিঃ পুরুষোত্তমদাসদের বাড়ির দিকে যেতে হ'ল। তাঁদের বাড়িটা পাহাড়ের উপরে, জায়গার নাম Bluff। এখানে অনেক বিদেশী লোকের বাড়ি আছে। পুরুষোত্তমদাসদের বাড়ি খুঁজতে একটু বেগ পেতে হ'ল। তাঁরা তখন বাড়ি ছিলেন না। আধ ঘণ্টা খানেক বেড়িয়ে এসে দেখা হ'ল এবং অনেকক্ষণ গল্প চল্লো। তার পরে রিক্সা করে হোটেলে ফিরলাম। বিকেলে দোকানে ঘুরে কিছু কেনা বেচার কাজ করা গেল।

৯ই জুলাই—

আজ সকালে আমরা কিছু কিন্‌তে চীনে মাটির দোকানে গেলাম। সেখানে চায়ের পেয়ালা পিরিচ একসেট্ কিন্‌লাম। গ্র্যাণ্ড হোটেলের কাছে সমুদ্রের ধারে একটু বেড়ান গেল। সমুদ্রের ধারে রাস্তার উপরেই এই হোটেলটা আছে। অনেক লোকে হোটেলের বারান্দায় বসে সমুদ্র দেখে। আমরা প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত সেখানে বসে সমুদ্রের শোভা দেখতে লাগ্‌লাম।

১০ই জুলাই—

আজ সকালে আমরা আবার দোকান করতে বেরুলাম। আজও বেশ গরম। ফেরবার্ সময়ে মিঃ সবরওয়ালের সঙ্গে দেখা হ'ল। ইনি Asian Review (এসিয়ান্ রিভিউ) এর আফিসে কাজ করেন। আজ

চার পাঁচ বৎসর জাপানেই আছেন; বাড়ী পাঞ্জাবে। খুব তেজী লোক। আমরা তাঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ কর্‌লাম। আমরা হোটেলে ফিরবার অল্প পরেই তিনি এলেন। দেখলাম তিনি বেশ জাপানি বলতে পারেন। ডিনার শেষ হয়ে গেলে তিনি টোকিয়ো চলে গেলেন।

১১ই জুলাই—

আজ সকালে মিঃ ও মিসেস পুরুষোত্তমদাস আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আগেই বলেছি আমার স্বামী যখন বিলেত যান, তখন বোম্বেতে তিনি পুরুষোত্তমদাসদের বাড়িতে কয়েক দিন ছিলেন। পুরুষোত্তমের ঠাকুরমা ও দিদিমা ওঁকে খুব যত্ন করে ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন মিঃ পুরুষোত্তমদাস হু'বৎসরের শিশু। এঁরা বেশ লোক, মিসেস পুরুষোত্তমদাস বেশ শান্ত-শিষ্ট মেয়ে। বেচারির এখানে বড় একলা লাগে। পার্শিদের সঙ্গে তাঁদের সে রকম মিশ খায় না। দেশের অন্য ভদ্র মহিলাও এখানে বড় দেখা যায় না। আমরা পুরুষোত্তমদের কাল লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলাম। কিন্তু ওঁরা মাংস খায় খান না বলে চা-খাবার জন্য আসবেন ঠিক্‌ হ'ল। কথা হল চা খাবার পরে মোটরে করে তাঁরা আমাদের ইয়োকোহামা সহরটা দেখিয়ে আন্‌বেন। আজ মিঃ হাস্‌রা-জানির বাড়িতে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ, কাজেই সেখান যেতে হল। এখানে কুবেরজি নামে একটি ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। ইনি ব্যবসা করেন এবং এদিকে আবার চিত্রকর। তা' ছাড়া হাত দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ বলবার ক্ষমতাও তাঁর আছে দেখ্‌লাম! মিঃ হাস্‌রাজানি আমাদের বেশ খাওয়ালেন। প্রথমে পোলাও, তার সঙ্গে চার পাঁচ রকম নিরামিষ তরকারি এবং হাতে গড়া রুটি। এঁরা সিন্ধুদেশের লোক; মাংস খান না। অনেককাল পরে দেশী খাবার খেয়ে খুব তৃপ্তি

বোধ করলাম। খাবার শেষে আইস্ ক্রিম ও ফলও ছিল। এদের জাপানি মেয়ে-রাঁধুনি আছে। সে বেশ ভারতীয় খাবার রাঁধতে শেখেছে দেখ্‌লাম। খাওয়া হয়ে গেলে, আরো-কতকগুলি সিন্ধি ভদ্রলোক বেড়াতে এলেন। মিঃ হাস্‌রাজানির সহকারী ভদ্রলোকটি হারমোনিয়ম বাজিয়ে কয়েকটা গান করলেন। আমাকেও রবি বাবুর "অয়ি ভুবন-মন-মোহিনী" গানখানা গাইতে হল। খানিকক্ষণ বেশ আনন্দে কাটানো গেল। তার পরেই আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। বিকালে আমাদের কিছু জিনিষপত্র কিনবার জন্য বাজারে যেতে হয়েছিল।

১২ জুলাই—

আজও সকালে আমরা দোকানে গেলাম। বিকেলে মিঃ ও মিসেস পুরুষোত্তমদাস চা খেতে এলেন। চায়ের পরে আমরা তাঁদের মোটরে করে ইয়োকোহামা সহরটা দেখতে বেরুলাম। প্রথমে আমরা মিঃ হারার বাগান দেখ্‌তে গেলাম। এই বাগানের বাড়িটায় আমাদের রবিবাবু কিছুদিন বাস করে গেছেন। বাড়িটা খুব উঁচুতে, অনেকটা উঠে তবে বাড়িতে যেতে হয়। আমরা বাড়িতে না গিয়ে কেবল বাগানটাই দেখ্‌লাম। বাগানটি বড় সুন্দর, অনেক রকমের গাছ আছে। এখানে পদ্মফুলের গাছও দেখ্‌লাম। বাগানের ভিতর দিয়ে হেঁটে একটা ছোটো পাহাড়ের উপরে উঠা গেল। সেখান থেকে সমুদ্রকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। দূরে ফুজি পাহাড়ও দেখা গেল। সমুদ্রের হাওয়া আসে বলে এখানে বসবার জায়গা আছে। দেখলাম অনেক জাপানি ভদ্রলোক সেখানে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। আমরাও একটু বসলাম। তার পরে নীচে এসে মোটর করে সমুদ্রের ধারে অনেক ঘুরলাম। এদেশের সমুদ্রের ধারগুলি সুন্দর কিন্তু সেখানে বসবার জন্যে বেঞ্চ্ ইত্যাদির বন্দোবস্ত নেই। ইয়ুরোপে এই রকম জায়গায় কত ব্যাণ্ড্

বাজে, কত আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। হাজার হাজার লোক সেখানে বেড়াতে যায়। কিন্তু এদেশের লোক বিকেলে হাওয়া খেতে বার হয় না। যা হোক অনেক রাস্তা দেখে শেষে আমরা Bluff বাগান দেখ্‌তে গেলাম। সেখানে এক জন জাপানি বড়লোকের মূর্ত্তি আছে। লোকটির জীবনের একটু ইতিহাস আছে। শুনলাম, ইনিই প্রথমে বিদেশের লোককে জাপানে ঢুক্‌তে দেন। এতে জাপানিরা রেগে তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু পরে যখন দেখলে যে, জাপানে বিদেশীরা আসায় বাণিজ্যের উন্নতি হচ্ছে, তখন ওরা অনুতপ্ত হয়ে সেই লোকটার একটা মূর্ত্তি তৈয়ারি করে রেখে দিলে। যা' হোক রাস্তার ধারে বেড়ানো হ'লে সেই গ্র্যাণ্ড্‌ হোটেলের সামনে সমুদ্রের ধারে যে বেঞ্চ ছিল সেখানে বসে অনেক ক্ষণ গল্প গুজব কর্‌লাম। হোটেলে ফিরতে প্রায় সাতটা বেজে গেল।

১৩ই জুলাই—

যা কিছু কিনবার ছিল আজ সকালে বেরিয়ে কতক কিনলাম। লাঞ্চের পরও এরি জন্যে দোকানে ঘুর্‌তে হলো। বড় ক্লান্ত হয়েছিলাম, তাই বিকেলে না বেরিয়ে কিছু প্যাকিং করা গেল।।

১৪ই জুলাই—

যা কিছু বাকি ছিল, আজ সকালে সব কেনা গেল। বিকেলে আমরা পুরুষোত্তমদের বাড়িতে চা খেতে গেলাম। আইস্ ক্রিম্, কেক্ ইত্যাদি খাওয়া গেল। মিসেস সেট্‌না আমাদের সঙ্গে চা খেয়ে দু'টা হিন্দি গান কর্‌লেন। আমিও একটা বাংলা গান গাইলাম। তার পরে আমরা Bluff পার্কটাতে বেড়াতে গেলাম। দেখলাম সেখানে ইংরেজদের একটা টেনিস্ ক্লাব আছে। এরা যেখানে যায়, সেখানে নিজেদের

সভা সমিতি ক্লাব করে বেশ জমিয়ে তোলে। সত্যই এরা আনন্দে থাকতে জানে। কিন্তু আমরা যেখানে যাই সেখানে একা। একতা নাই বলে আমাদের এই দশা। জাপানে এত ভারতবাসী আছে কিন্তু তাদের একতা নাই বলে ইয়োকোহামাতে আমাদের একটা ক্লাব নাই, যেখানে সকল ভারতবাসী এক সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে ও খেলা করতে পারে। ভারতীয়দের এই যে মিলবার মিশবার অপ্রবৃত্তি আমাকে বড় ক্ষুণ্ণ করলে। যা হোক আমরা ঘুরে ফিরে সাতটার সময় হোটেলে ফিরলাম।

১৫ ই জুলাই—

আজ সকালে অল্প কিছু প্যাকিং করা গেল। লাঞ্চের পরে মিঃ মজুমদার এলেন। আমার স্বামী মিঃ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে ও কুকের বাড়ীতে গেলেন। শুনলাম তাঁরা পরে মিঃ হাস্‌রাজানিদের একটা ক্লাবে গিয়েছিলেন। এই ক্লাবে সিন্ধি ভিন্ন অন্য ভারতবাসী প্রবেশ করতে পারেনা। আগে পার্শিদের সঙ্গে এর যোগ ছিল। এখন পার্শিরা ঝগড়া করে এই ক্লাব ছেড়ে দিয়েছে। শুনলাম আমার স্বামী সেখানে বিলিয়ার্ড খেলেছিলেন। মিঃ মজুমদার ও আমার স্বামী প্রায় সাড়ে আটটায় ফিরলেন। মিঃ মজুমদারকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করা গেল। তিনি আজ রাত্রির মতো ইয়োকোহামাতে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে রইলেন। ঠিক হ'ল কাল আমাদের জাহাজে উঠিয়ে নিয়ে টোকিওতে ফিরবেন। প্যাকিং সবই আজ শেষ করা গিয়াছে।

ফির্তি পথে

১৬ শে জুলাই

আজ আমাদের যাত্রার দিন। আটটায় ব্রেক্‌ফাষ্ট খাওয়া গেল। ঘণ্টা খানেক পরে আমরা মোটরে করে জাহাজের Wharfএ গেলাম। গিয়েই দেখি মিঃ হাস্‌রাজানি প্রভৃতি অনেকগুলি ভারতীয় ভদ্রলোক আমাদের বিদায় দিতে এসেছেন। দেখতে দেখতে টোকিয়ো ও ইয়োকোহামার পরিচিত আরও অনেক ভারতবাসীরা আমাদের বিদায় দেবার জন্য এলেন। মিঃ মজুমদার ত সঙ্গেই ছিলেন। পুরুষোত্তম দাস একটা টুকরিতে করে অনেক সুন্দর ফুল আমাদের উপহার দিলেন। যাতে বাইরের লোক সব নেমে যায়, তার জন্যে এগারোটার সময়ে ঘণ্টা বাজ্‌ল। যাঁরা আমাদের বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই অভিবাদন করে নেবে গেলেন। তারপর জাহাজ ছাড়তেই তীর থেকে সকলে "বেন্‌জাই" বলে চিৎকার করতে লাগলেন। "বেন্‌জাই" কথাটা ইংরেজী "Hurrah" (হুর্‌রে) র প্রতিশব্দ। কতকগুলা জাপানি ভদ্রলোক লাল ও গোলাপি কাগজের ফিতা এনেছিলেন। তাঁরা সেই ফিতা জাহাজের রেলে বেঁধে তীরে নেমে সেগুলাকে হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অর্থাৎ কিনা কাগজের সিকল দিয়ে আটকে জাহাজের গতি রোধ কর্‌ব। কিন্তু জাহাজ ছাড়লে ফিতা গুলা পট্‌পট্‌ ছিঁড়ে গেল। ওরা টুপি খুলে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রইল, যতক্ষণ দেখা গেল আমরাও ততক্ষণ রুমাল নাড়তে লাগলাম। জাহাজের নাম "ইয়ো মারু"।

জাহাজটা খালি ছিল তাই ভয়ানক দুল্‌তে লাগল। দেখলাম যাত্রীদের মধ্যে অনেক জাপানি আছেন। কমাণ্ডার্ কোগা নামে নৌবিভাগের একজন বড় কর্ম্মচারী, মিঃ ও মিসেস সায়তো এবং মিঃ

মেসিয়ামা নামে একজন বড় বনিক যাত্রীদের মধ্যে আছেন। এরা কেউ সাংহাই কেউ বা হংকংএ নেমে যাবেন। নৌবিভাগের কর্ম্মচারীটি মার্শেল্ পর্য্যন্ত যাবেন শুন্‌লাম। বিকেলে জাহাজের দোলানি খুব বেড়ে গেল। আমাদের যেন একটু গা-বমির ভাব হল। জাপানিরা দেখ্‌লাম বেশ মিশুক লোক, তারা নিজেরাই এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। জাহাজের চাকরগুলো কিন্তু ভাল নয়। শুনেছিলাম জাপানি জাহাজের চাকর বাকর খুব ভালো, আমার কিন্তু তা মনে হ'ল না। টাকাডা নামে যে জাহাজটায় আমরা জাপানে এসেছিলাম তার চাকর বাকর ভাল ছিল। এই জাহাজে কলের জল পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে জল এনে ঢেলে দেয়, শুধু লোনা জল স্নানের জন্য কলে আসে। টাকাডার ষ্টুয়ার্ডেস্ বেশ লোক ছিল। এ জাপানি ষ্টুয়ার্ডেস্ তেমন নয়। সবে নূতন কাজে লেগেছে সে জন্যে কিছুই জানেনা এবং ইংরেজিও ভাল বলতে পারেনা। স্নানের জন্য টাকাডাতে অনেক জল দিত; এখানে ছোট টবে মাত্র এক টব জল দেয়। বড় মুস্কিলে পড়েছি। যা হোক কোন রকমে চালাতেই হবে। বিকেলে ফুজি পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য দেখা গেল। মিঃ লেকোস নামে একজন গ্রীক ভদ্রলোক আমাদের সহযাত্রী ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হ'ল। ডিনারের পরে তিনি আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করলেন। কয়েকটা গান গাইতে হ'ল।

১৭ই জুলাই—

আমাদের জাহাজ কোবের দিকে চলেছে। সাড়ে আটটার সময়ে জাহাজে ব্রেকফাষ্ট খাওয়া গেল। বাইরে এসে দেখি জাহাজের অনেক যাত্রীই মাঝ-সমুদ্রে একটা ছোটো নৌকার দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখা গেল নৌকা থেকে একটা লোক কাপড় উড়িয়ে আমাদের জাহাজের দিকে সঙ্কেত করছে। বোঝা গেল নৌকাটা বিপদে পড়েছে। সেই সময়ে

একটা মালের জাহাজ কাছ দিয়ে চলে গেল কিন্তু সেখানা নৌকাটাকে সাহায্য করতে দাঁড়ালো না। আমাদের জাহাজ নৌকার কাছে গেলে নৌকা থেকে দু'টো লোক ছোটো ডিঙ্গি করে আমাদের কাছে এলো। দেখলাম তাদের নৌকার মাস্তুলটা ভেঙ্গে নৌকার উপর পড়ে রয়েছে। এতেই সেখানা ডুবু ডুবু হয়েছিল। আমাদের জাহাজ রক্ষা না করলে লোক দুটো ডুবেই মরতো। যা হোক ডিঙ্গিটা বহু কষ্টে আমাদের জাহাজের কাছে এলো। তখন সমুদ্রে খুব বড় বড় ঢেউ উঠছিল। জাহাজ থেকে একটা দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিলে, তাই ধরে লোক দু'টো জাহাজে উঠলো। শুনলাম তারা জেলে; মাছ ধরতে বার হয়ে এই বিপদে পড়েছে। তাদের সঙ্গে একটা ছাতা এবং একটা বেতের বাক্স ছিল। ছাতাটা ডিঙ্গিতেই রইল। বাক্সটা দড়ি বেঁধে জাহাজে উঠানো হ'ল। বাক্সের ভিতরে অনেকগুলো কাপড় চোপড় ছিল। তাই পরে লোক দু'টো কাপ্তানের সঙ্গে দেখা করতে গেল। কিন্তু তাদের ডিঙ্গি নৌকাখানা সমুদ্রেই পড়ে রইল। বোধ করি সেটা খুব জখম হয়েছিল, কারণ যখন আমাদের জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে তখন ডিঙ্গিটাকে আর দেখা গেল না।

পাঁচটার সময় আমাদের জাহাজ কোবে পৌঁছল, কিন্তু পারে ভিড়ল না। লঞ্চ এসে সকলকে নিয়ে গেল। আমরা ছটার সময় লঞ্চে করে ডাঙ্গায় গেলাম এবং সেখান থেকে রিকশা করে আবদুল আলিদের বাড়ি গেলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে থাকা হ'ল না। কারণ সাতটার পরে জাহাজে ডিনার পাওয়া যাবেনা। কাজেই মোটর করে সমুদ্রের ধারে আসা গেল। এসেই দেখি একখানা লঞ্চ জাহাজে যাবার জন্য ছাড়ছে তাতে আমাদের জাহাজের "কেবিন-বয়" ছিল। সে আমাদের উঠতে বললে। কিন্তু শুনলাম লঞ্চটা আগে কাতোরি মারু জাহাজের যাত্রীদের পৌঁছে দেবে,

তার পরে আমাদের জাহাজে আসবে। কাতোরি মারুতে লাগতেই আমরা জাহাজটা দেখতে গেলাম। জাহাজটা বেশ বড়, কুড়ি হাজার টনের। খুব বড় সোসাল্ হল্ আছে; কেবিনের সংখ্যা ও অনেক। এখানে আমাদের লঞ্চ্‌কে সাতটা থেকে প্রায় সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত রেখে দিলে। আমরা যখন নিজেদের জাহাজে পৌছলাম তখন ডিনার হ'য়ে গেছে। চাকরদের বলতে তারা ঝাড়া জবাব দিলে এখন ডিনার পাওয়া যাবে না। তার পর আমরা যখন বল্লাম ডেকষ্টুয়ার্ড ঐ লঞ্চে নিয়ে দেরি করে দিয়েছে তখন আমাদের কিছু ঠাণ্ডা মাংস রুটি ও কফি দিলে। আমাদের জাহাজে যে গ্রীক লোকটা ছিল সেও তাই খেলে। জাহাজের চাকর বাকর কিন্তু ভাল নয়, তাদের আদব কায়দা খুবই খারাপ। আমরা শুনেছিলাম এই কোম্পানির সবই ভালো, কিন্তু তার কোনো পরিচয় পাচ্ছিনা।

১৮ই জুলাই—

আব্দুল আলীরা আজ আমাদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছেন। ব্রেকফাষ্ট করে আমরা ছোটো জাহাজে করে কোবেতে গেলাম। সেখানে ওরিয়েণ্টাল হোটেলে গিয়ে মিঃ আব্দুল আলীকে মোটর পাঠাবার জন্য টেলিফোন্ করলাম। তিনি বলেছেন, খবর পেলেই আমাদের জন্যে মোটর পাঠাবেন। মোটর এলে আমরা তাতে করে বাজারে দু'চারটা জিনিষ কিন্‌তে গেলাম। কিন্তু বাজারের রাস্তায় মোটর নিতে দেয় না। রাস্তার দু'ধারেই দোকান, হেঁটে কেনা বেচা করতে হয়। বাজার করা শেষ হ'লে মিসেস্ সুকামোটোর বাড়ি গেলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। মিঃ সুকামোটোর একটি Walking Society অর্থাৎ পদব্রজে বেড়াবার সমিতির মেম্বর। তাই তিনি সকালে বেরিয়েছেন। শুনলাম, তিনি ঐ সোসাইটির সভ্যদের সঙ্গে পাহাড়ের উপরে এবং আরো নানা জায়গায়

বেড়াতে যাবেন। এদেশে অনেক ব্যাপারেই এই রকম সোসাইটি বা সমিতি আছে। এমন কি রিকসাওয়ালাদের সোসাইটি ও ক্লাব আছে। কিছু ফুল সঙ্গে এনেছিলাম, মিসেস্ সুকামোটোকে তা উপহার দিলাম। তার পরে অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প করা গেল। একটু পরে তাঁর ভাইঝি ও ভাইঝির স্বামী এলেন। এদের খুব সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে। স্বামীর নাম মিঃ কুদো। ইনি দশ বৎসর আমেরিকায় বাস করে দন্তচিকিৎসক হয়ে ফিরেছেন। আমেরিকাতেই তিনি চিকিৎসা ব্যবসা করেন; শীঘ্রই স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকায় যাবেন। তার পরে আমরা আব্দুল আলীদের বাড়ি গেলাম। মিসেস্ আব্দুল আলী ভয়ানক পরদানসিন। আমার স্বামীর সম্মুখে তিনি বার হলেন না। আমার স্বামী মিঃ আব্দুল আলীর সঙ্গে ডাইনিং রুমে লাঞ্চ খেতে লাগলেন, এবং আমি ও মিসেস্ আব্দুল আলী ড্রয়িং রুমে লাঞ্চ্ খেলাম। লাঞ্চে পোলাও, কালিয়া প্রভৃতি দেশী খাবার ছিল। খাওয়ার পরে ড্রয়িং রুমে বসে মিসেস্ আব্দুল আলীর সঙ্গে অনেক্ষণ গল্প করা গেল। চারিটার সময় চা খেয়ে আমার স্বামী মিঃ দাস ও ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আমি ও মিসেস্ আব্দুল আলি তাঁর ভায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বার হলাম। মিঃ কাঁগাওয়ার সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন ছিল, তাই আমার স্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য মিঃ আব্দুল আলির মোটর নিয়ে এলেন। আমরা আব্দুল আলির ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কাঁগাওয়াদের বাড়ি গেলাম। মিঃ কাঁগাওয়া বাড়ি ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী আমাদের আদর করে বসালেন। কিন্তু ইনি ইংরেজি জানেন না বলে বিশেষ কথা-বার্ত্তা হ'ল না। 'একটু পরেই মিঃ কাঁগাওয়া এলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁর সঙ্গে গল্প করার পর আমরা আব্দুল আলীদের বাড়িতে এলাম। তখন প্রায় সাতটা হয়ে গেছে, সাতটার আগে জাহাজে না গেলে ডিনার

পাওয়া যাবে না বলে, আমরা ওরিয়েন্টেল হোটেলে ডিনার খাব ঠিক করেছিলাম। আব্দুল আলিরা তাই শুনে আমাদের হোটেলে খেতে দিলেন না। স্থির হ'ল আব্দুল আলিদের বাড়িতেই আমরা ডিনার খাবো। ডিনারের আগে আবার বাজারে বার হওয়া গেল, দু'চারটা জিনিষ কিনবার জন্য। ডিনারের সময় দেখলাম আব্দুল আলির ভাইয়ের স্ত্রী এসেছেন। আমরা তিন জন মেয়ে ড্রয়িংরুমে খেলাম এবং পুরুষেরা ডাইনিং রুমে খেলেন। খাবার পরে মিঃ আব্দুল আলি তাঁর মোটর করে সমুদ্র পর্য্যন্ত আমাদের এগিয়ে এলেন। কিন্তু সমুদ্রের ধারে এসে দেখা গেল লঞ্চ্ নেই। তাই সামপান্ নৌকা করে আমাদের জাহাজে যেতে হবে স্থির হোল। আমার স্বামী ভাল জাপানি জানেন না, সে জন্য মিঃ আব্দুল আলি আমাদের সঙ্গে সামপানে উঠে জাহাজ পর্য্যন্ত এলেন। আব্দুল আলিরা বড় ভাল লোক, এঁরা আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন।

১৯ শে জুলাই

আজ সকালে আমার স্বামী কোবে গেলেন, ব্যাঙ্কে ও দোকানে কাজ ছিল। আমি আর বেরুলাম না। ইতিমধ্যে মিঃ কাঁগাওয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'ল না বলে খুব দুঃখ করতে লাগলেন। আমার স্বামী লাঞ্চের একটু আগে ফিরে এলেন। চারটার সময় জাহাজ কোবে ছাড়ল। তার আগে ব্যারন্ হায়াসি এক জন জাপানি মার্কুইস্ এবং আরো অনেক জাপানি যাত্রী জাহাজে উঠেছিলেন। ব্যারন্ হায়াসি ইংলণ্ডের জাপানি রাজদূত (Ambassador) মার্কুইসটি ছেলে মানুষ, বয়স ষোল সতরো হবে। তাঁর নাম "হাচিস্থকা" ইনি ব্যারন্ হায়াসির তত্ত্বাবধানে ইংলণ্ডে পড়াশুনা করতে যাচ্ছেন। একজন মিসনারী ও তাঁর স্ত্রীও জাহাজে উঠলেন দেখলাম। যা হোক

এই সব নূতন যাত্রী জাহাজে আসবার পরে চাকরেরা বেশ ফিট্‌ফাট্‌ কাপড়চোপড় পরলে ; খাওয়া দাওয়া কতকটা ভাল হ'ল। আজ আর চা পাওয়া গেল না। অনেক বলার পরে আমাদের কেবিনে দু'তিন পেয়ালা চা ও কেক্‌ এলো। আজ ডিনারে সব জায়গাই প্রায় ভরে গেছে। মিসনারিদের এবং মার্কুইসের সঙ্গে আমার স্বামীর আলাপ হ'ল। মার্কুইস হাচিসুকা ছেলেটি বেশ, আমার ছেলের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল।

২০শে জুলাই

আজ সকালে সমুদ্রে বিশেষ ঢেউ নেই। আমার ছেলে মার্কুইস হাচিসুকার সঙ্গে খেলা করলে। লাঞ্চের পরে জাহাজ মোজিতে এলো। আমরা তিনটের সময় একবার জায়গাটা দেখবার জন্য বার হলাম; কয়েকটা জিনিসও কিনবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মোজি জায়গাটা ছোট, তেমন দোকান নেই। আধ ঘণ্টা খানেক বেড়িয়ে জাহাজে ফিরলাম। জাপানি যাত্রীরা প্রায়ই সকলে সিমানোসাকি হোটেলে বা বন্ধুদের বাড়িতে খেতে গিয়েছে। আমরা কয়েক জন ও সেই মিসনারি দম্পতি মিঃ ও মিসেস্ বেণ্ড্‌ ডিনার খেলাম।

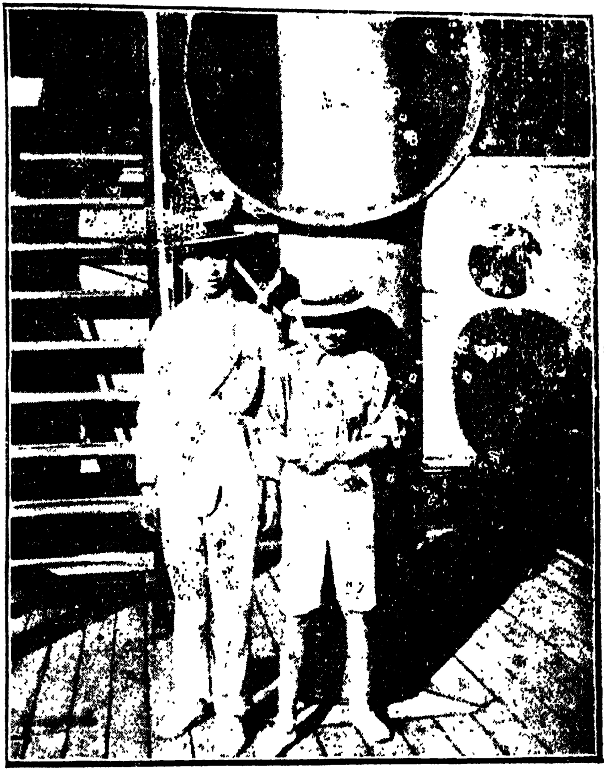
২১শে জুলাই—

আজ সকালে প্রাতর্ভোজনের পরে আমরা আর একবার মোজিতে গেলাম। বিশেষ কাজ ছিল না, কয়েক খানা চিঠি ডাকঘরে দিয়ে ফিরে এলাম। ব্যারণ হায়াসিরা দলবল নিয়ে সহরে গিয়েছিলেন ; তাঁরা ফিরে এলেন। জাহাজ ঠিক বারটার সময় ছেড়ে দিলে।

২২শে জুলাই—

আজ আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা হল না। নিশ্চিন্ত হয়ে অনেকক্ষণ পড়া শুনা করা গেল। আমার ছেলের সঙ্গে মার্কুইস

হাচিসুকার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। তারা দুজনে সমস্ত দিন Quoits খেলা করলে।



বীরেন্দ্রসদয় ও মার্কুইস হাচিসুকা

২৩শে জুলাই—

আমাদের জাহাজ আজ সকালেই নদীতে এসে পড়েছে। সকালে

আমি যখন বাংলায় ডায়েরি লিখ্‌লাম, জাপানিরা খুব কৌতূহলী হয়ে আমার লেখা দেখতে লাগ্‌লো। বেলা চারটায় জাহাজ সাংহাই পৌঁছল। প্রায় সব জাপানি যাত্রীই লঞ্চে করে তীরে গেল। জাহাজ ঠিক কিনারায় লাগে নি। রাত্রিতে কেবল আমরা কয়েকজন ডিনার খেলুম, কারণ সব যাত্রীরা সহরে চলে গেছে।

২৪ শে জুলাই—

আজ সকালে প্রাতের আহারের পর আমরা সাংহাইতে গেলাম। আমার ছেলে সঙ্গে যেতে চাইলে না। একজন জাপানি নৌ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়ে গেছে। সেই জাপানিটির সঙ্গে সে জাহাজেই রইল। আমরা জাহাজ থেকে নেমেই প্রথম নান্‌কিন্‌ রোডে গেলাম। বড় সুন্দর রাস্তা, সেখানে অনেক বড় বড় দোকান আছে। বই কিন্‌বার জন্যে কয়েকটা বইয়ের দোকানে ঘোরা গেল; কিন্তু মনের মত বই পাওয়া গেল না। এখানে দেখ্‌লাম অনেক ভারতবাসী শিখ্‌ পাহারাওয়ালা আছে। আরো একটু ঘুরে আমরা বারটার সময় জাহাজে ফিরে এলাম। জাহাজে এসে দেখি, আমাদের কেবিনে পাখাটা খারাপ হয়ে গেছে। জাহাজে জাপানি ইলেক্‌ট্রিক্‌ এন্‌জিনিয়ার আছে। সে দুই ঘণ্টার চেষ্টার পরে পাখাটা মেরামত করে দিলে। বিকেলে অনেক নতুন যাত্রী এলো এবং পুরাণো যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন চলে গেল। নতুনদের মধ্যে একটি রুষদেশীয় লোককে তার পনের বছরের মেয়ে এবং বার বছরের ছেলেকে নিয়ে উঠ্‌তে দেখ্‌লাম; একজন বুড়ো ডাক্তারও উঠলো। যারা তীরে গিয়েছিল তারা রাত-নয়টায় ফির্‌লো। কাল ভোর চারটায় জাহাজ ছাড়বে। যাহোক্‌, জাহাজ কোন বন্দরে লাগলে প্রায়ই Service (খাওয়াদাওয়ার পরিবেশন) খারাপ হয়। কেন এরূপ হয় জানি না। সাংহাই জায়গাটা খুব গরম নয়; জাপানের চেয়ে ঠাণ্ডা বোধ হ'ল।

২৫শে জুলাই—

আজ সকালে উঠেই দেখি জাহাজ ছেড়েছে। বড় মেঘ করে আছে। আমাদের পাশের কেবিনে এক নববিবাহিত দম্পতি ছিলেন। তাঁরা ফ্রান্স ও লণ্ডনে যাচ্ছেন। আমাদের নিমন্ত্রণ করে তাঁরা জাপানি চা খাওয়ালেন। একটু পরেই ঝড়ের মতো হাওয়া উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হতে লাগ্‌লো। প্রথম শ্রেণীতে চারজন জাপানি মহিলা ছিলেন, তাঁদের সি-কিক্‌নেস্ অর্থাৎ গা-বমি হয়েছে। কেউ লাঞ্চ্ খেলেন না। আমরা বেশ ছিলাম, লাঞ্চ্ খেলাম। বিকেলে রীতিমত ঝড় আরম্ভ হ'ল। জাহাজ খুব দুল্‌তে লাগ্‌ল। বড় বড় ঢেউয়ে নীচের ডেক ভেসে যেতে লাগ্‌ল। আমাদের কেবিনেই চা খেতে হ'ল। জাহাজ তখনও খুব দুল্‌চে। খানিকক্ষণ ডেকে বেড়ালাম এবং নতুন যাত্রীদের সঙ্গে বসে বসে গল্প কর্‌লাম। এদের অনেকেই চীন থেকে আস্‌ছে। ডিনারের সময়ে দেখি অনেক জাপানি যাত্রী ডিনারে আসেনি। শুনলাম তাদের সি-সিক্‌নেস হয়েছে। রুষদেশীয় যাত্রীটির মেয়েটিও ডিনার খেলে না, সেও সি-সিক্ হয়েছিল। যে বুড়ো ডাক্তারটি সাংহাইয়ে উঠেছেন তিনি ডিনারের পরে নানা রকম গল্প ও ম্যাজিকের মতো কৌশল দেখিয়ে সকলকে হাসাতে লাগ্‌লেন। লোকটা বেশ রসিক। যখন শুতে গেলাম তখন রাত্রি নয়টা,—তখনো ভয়ানক ঝড় হচ্ছে, বড় বড় ঢেউ উঠছে এবং জাহাজ ভয়ানক দুল্‌ছে। একটু ভয় হলো।

২৬শে জুলাই—

আজ সকালে ঝড় অনেক কমেছে; কিন্তু ভয়ানক হাওয়া বইচে। কেবিনেই চা খাওয়া গেল। লাঞ্চের পরে দেখি সমুদ্র খুব শান্ত হয়েছে। কালকের সেই রুদ্র মূর্ত্তির সঙ্গে আজকের এই মূর্ত্তির আকাশ পাতাল

তফাৎ। সাতটার পরে ডিনার খেয়ে দেখি ফুটফুটে চাঁদনি রাত হয়েছে। ডিনারের পরে সেই রুষ দেশীয় লোকটি ও তার মেয়ের সহচরী আমাদের সঙ্গে ব্রিজ খেলতে চাইলে। একজন জাপানি যাত্রীও এসে পড়লো, তিনটা রবার্ খেলা গেল। বলা বাহুল্য সখ্ করে খেলা গেল; বাজি রেখে নয়। সাড়ে নয়টার সময় কেবিনে এসে দেখি আমার ছেলে শুয়ে শুয়ে কাঁদচে। কারণ কিছু বুঝলাম না। জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, আমরা ওকে বিলেতে রেখে আসবো বলে তার মন কেমন করচে। আমারও মনটা খারাপ হ'ল। আমার স্বামী তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন তাকে একা রেখে আস্বেন না। সে এই কথা শুনে শান্ত হ'ল।

২৭শে জুলাই—

আমরা এখন হংকংএর পথে চলেছি। আজ সকালে একজন জাপানি যাত্রী টোকিয়ো থেকে বিনাতারে টেলিগ্রাম পেলে। বড় আশ্চর্য্য লাগ্লো। মহাসমুদ্র, কিছু নেই, কেবল জল—আর জল। হঠাৎ Bon-voyage বলে খবর এলো। যা হোক আজ খুব রোদ হয়েছে এবং গরমও বোধ হচ্ছে। ব্রেকফাষ্টের পরে জাহাজের সাম্নের ডেকে চেয়ারে বসে সেলাই করছিলাম। এমন সময়ে অনেকগুলি জাপানি ভদ্রলোক ও একটি জাপানি মেয়ে আমাদের পাশের কেবিন থেকে এসে কাছে বস্লো। মেয়েটির নাম মিসেস্ তামুরা। একটু একটু ইংরেজি বলতে পারে। তারা কিছুক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে গল্প করলে। এরা বেশ আলাপী। মিসেস্ তামুরা ব্রিজ খেলা জানে না, শিখ্তে ইচ্ছে করলো। তাকে খেলা শিখিয়ে দিলাম। সেই বুড়ো রাশিয়ান এবং ব্যারণ হায়াসিও খেলায় যোগ দিলেন। বুড়ো জর্জ্জিয়েফ্ ব্রিজ খেলাতে একজন বড় ওস্তাদ। আজ ভয়ানক গরম লাগ্ছে। খেলা-ধুলার পরে ব্যারণ হায়াসি আমাদের Lemon Squash



৬২ ইয়োমারু জাহাজ—মার্কুইস্ হাচিসুকা, সরোজনলিনীর স্বামী, মিঃ তামুরা মিসেস তামুরা বীরেন্দ্রসদয় ও সরোজনলিনী

খাওয়ালেন। আমার ছেলে সকলের সঙ্গে মিশে গেছে, সকলেই তাকে বেশ ভাল বাসেন। মার্কুইস্ হাচিসুকা, সেই জাপানি নৌকর্ম্মচারী এবং জাহাজের তৃতীয় কর্ম্মচারী (Third officer) প্রায় আমার ছেলের খোঁজ-খবর করে।

২৮শে জুলাই—

সকালে উঠতেই কেবিন বয় এসে বল্লে, জাহাজ এখনই হংকংএ পৌঁছবে; তাই আজ ব্রেকফাষ্ট সাড়ে আটটায় না হয়ে আটটায় হবে। আমরা নিশ্চিন্ত আছি, হঠাৎ টেবিলের বয় দরজাতে ধাক্কা দিয়ে বল্লে, ব্রেকফাষ্ট তৈয়ারি। তখনো আমাদের স্নান হয়নি। ভারি খারাপ লাগ্‌ল। যাত্রীদের আরামের উপর জাহাজের কর্ত্তাদের একটুও দৃষ্টি নেই। জাহাজের চাকরগুলো পর্য্যন্ত খারাপ। যা' হোক বিলাপ করে কোন ফল হবে না ভেবে, তাড়তাড়ি ব্রেকফাষ্টে যাওয়া গেল। জাহাজ হংকংএ লাগ্‌লো। লঞ্চ্ এসে অনেক লোককে নামিয়ে নিয়ে গেল। দেখলাম জাহাজের সিঁড়ির কাছে একজন পাঞ্জাবি সার্জেট্ পাহারা দিচ্ছে। আমার স্বামী তার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বল্লেন। লোকটাকে বেশ ভদ্র বলে মনে হ'ল। উনি তাকে এখানকার জল-হাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে বল্লে হাওয়া ভাল কিন্তু জল ভালো নয়। চীনেরা কি রকম লোক জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিলে, এরা বড় বদমায়েস্। একটা চুরি হয়েছিল, তাতে সে চোর ধরতে গিয়েছিল। চোরেরা ওকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে এবং গুলি তার পেটে লেগে পিঠের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। লোকটা আমার স্বামীকে সেই গুলির দাগ দেখালে এবং বল্লে এর জন্য তাকে ছয় মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। পুলিশে ও পল্টনে হংকং সহরে প্রায় পাঁচ হাজার পাঞ্জাবি লোক আছে। তা' ছাড়া এখানে অনেক ভারতবাসী কারবার



জাহাজের তরুণ যাত্রীর দল

জাহাজে ঘুরে বেরিয়েছে; মোজা পরেনি; খুব হাওয়া দিচ্ছিল; তাই বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। ওকে বিছানায় শুইয়ে শুধু দুধ আর সোডা খেতে দিলাম। জাহাজের ডাক্তার ডিনারের পরে দেখে বল্লেন সোজাসোজি জ্বর।

৩০শে জুলাই—

আজ সকালে উঠে দেখি মেঘ করে আছে। আমার ছেলের জ্বর নেই। ব্রেকফাষ্টের পরে আমার স্বামী ছেলের কাছে বসে গল্প করলেন উনি জাপান থেকে "What a young boy ought to know" নামে একটা বই এনে ছিলেন। জীবের উৎপত্তি কি রকমে হয়, তার বিবরণ এই বইয়ে ছিল। উনি সুযোগ পেয়ে আজ ছেলেকে এই সব বিষয় বুঝালেন। যখন টিফিন্ খেতে গেলাম তখন বৃষ্টি হচ্ছে। বিকেলে স্নান করা আমার বহুকালের অভ্যাস। কিন্তু আমার স্নানে যেতে বড় মুস্কিল হয়; কারণ আমার পাশের ঘরে মিঃ ও মিসেস তামুরা ও অন্য জাপানিরা তাদের বন্ধুদের নিয়ে মজলিস্ করে। কোন রকমে গিয়ে স্নান করে আসি। আমাদের জাহাজ এখন সিঙ্গাপুরের দিকে চলছে। আসবার সময় এই পথের মাঝে ভয়ানক গরম ভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু ফিরবার সময়ে তত গরম বোধ হল না।

৩১শে জুলাই—

আজ সকালে বেশ রোদ হয়েছে, একটু গরমও লাগছে। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নেই। ডিনারের পরে ব্যারিণের এবং সেই রাসিয়ান ভদ্রলোকটির সঙ্গে গল্প গুজব করা গেল।

১লা আগষ্ট—

আজ আবার সকালে মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। আজ



কয়েকজন জাপানি যাত্রী ও জাহাজের অফিসারগণ

রবিবার তাই নোটিস দেওয়া হয়েছে যে সাড়ে দশটায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মোপাসনা হবে। ঠিক সময়ে একটা চাকর আমাদের ডিনারের ঘণ্টাটা নিয়ে গির্জ্জের ঘণ্টার মত ঢং ঢং করে জাহাজের ডেকের উপর দিয়ে বাজিয়ে গেল। নীচে ডাইনিং সেলুনে উপাসনা হ'ল। সেই ব্যাণ্ড্ নামে যে মিসনারি জাহাজে ছিলেন, তিনিই উপাসনা কর্লেন। আমরা, জাপানিরা ও দু'চার জন ইংরেজ বাদে প্রায় সকলেই উপাসনায় যোগ দিয়েছিল। যখন উপাসনা হচ্ছিল তখন জাপানিরা এসে আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর্লে আমরা যাইনি কেন? উনি বল্লেন, আমরা খ্রীষ্টান নই, তাই যাই নি। [illegible]দের উনি জিজ্ঞাসা কর্লেন, ওরা যায় নি কেন? ওরা বল্লে, ব্যাপারটা ওদের ভালই লাগে না। আমরা খানিক-ক্ষণ ডেকে [illegible] করতে লাগলাম। মিঃ ইয়েকিবে নামে একজন জাপা[illegible]র স্বামী ফরাসী ভাষা শিখতে লাগ্লেন। ডিনারের পরে [illegible] কাছে জাপানিদের জাতীয় সঙ্গীতটা (National anthem) তিনি শিখে নিলেন। গলার সুর থাকুক আর নাই থাকুক জাপানি মাত্রেই তাদের জাতীয় সঙ্গীতটা জানে। এদের জাতীয় সঙ্গীতটার কথাগুলি নিম্নে দেওয়া গেল—

"কিমিগা ইওয়া
চিওনি ইয়াচিওনি
সিজারে ইশি নো
ই-ওয়াওতে নারিতে
কোকেনো মুস্থমাদে।"

ইহার অর্থ এই:—"আমাদের রাজা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করুন, যেন ততদিনে ছোট ছোট পাথর জোড়া লেগে বড় পাহাড় হ'য়ে যায় এবং তার উপর শেওলা জন্মে যায়"!

আর একটা জাপানি গান এখানে দিলাম। একজন জাপানির কাছে আমার স্বামী এটা শিখেছিলেন ঃ—

"তাকাই ইয়ামা কারা
তানি সোকো মিরেবা
উরি ইয়া নাসুবি নো
হানা জাকারি।"

ইহার অর্থ ঃ—"আমি উঁচু পাহাড়ের উপরে চড়ে নীচে উপত্যকায় দেখ্‌ছি তরমুজ ও বেগুনের ফুল ফুটে শোভা দিচ্ছে!"

আমার স্বামী জাপানি ভাষা একটু একটু শিখে নিয়েছেন। যাত্রীদের মধ্যে জাপানিরাই বিশেষ ভাবে ভদ্রব্যবহার দেখায় ও আমাদের সঙ্গে খুব মেশে। আমার ছেলেকেও ওরা খুব ভালবাসে।

সমাপ্ত।